সানাই

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী
কলিকাতা

শিরোনাম-সূচী

প্রথম ছত্রের সূচী

সানাই

দূরের গান

সুদূরের-পানে-চাওয়া উৎকণ্ঠিত আমি,
মন সেই আঘাটায় তীর্থপথগামী
যেথায় হঠাৎ-নামা প্লাবনের জলে
তটপ্লাবী কোলাহলে
ও পারের আনে আহ্বান
নিরুদ্দেশ পথিকের গান।
ফেনোচ্ছল সে নদীর বন্ধহারা জলে
পণ্যতরী নাহি চলে,
কেবল অলস মেঘ ব্যর্থ ছায়া-ভাসানোর খেলা
খেলাইছে এবেলা ওবেলা।

দিগন্তের নীলিমার স্পর্শ দিয়ে ঘেরা
গোধূলিলগ্নের যাত্রী মোর স্বপনেরা।
নীল আলো প্রেয়সীর আঁখিপ্রান্ত হতে
নিয়ে যায় চিত্ত মোর অকূলের অবারিত স্রোতে ;
চেয়ে চেয়ে দেখি সেই নিকটতমারে
অজানার অতিদূর পারে।

মোর জন্মকালে
নিশীথে সে কে মোরে ভাসালে
দীপ-জ্বালা ভেলাখানি নামহারা অদৃশ্যের পানে।
আজিও চলেছি তার টানে।

বাসাহারা মোর মন
তারার আলোতে কোন্ অধরাকে করে অন্বেষণ
পথে পথে
দূরের জগতে।

ওগো দূরবাসী,
কে শুনিতে চাও মোর চিরপ্রবাসের এই বাঁশি—
অকারণ বেদনার ভৈরবীর সুরে
চেনার সীমানা হতে দূরে
যার গান কক্ষচ্যুত তারা
চিররাত্রি আকাশেতে খুঁজিছে কিনারা।
এ বাঁশি দিবে সে মন্ত্র যে মন্ত্রের গুণে
আজি এ ফাল্গুনে
কুসুমিত অরণ্যের গভীর রহস্যখানি
তোমার সর্বাঙ্গে মনে দিবে আনি
সৃষ্টির প্রথম গূঢ়বাণী।
যেই বাণী অনাদির সুচিরবাঞ্ছিত
তারার তারায় শূন্যে হল রোমাঞ্চিত,
রূপেরে আনিল ডাকি
অরূপের অসীমেতে জ্যোতিঃসীমা আঁকি।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২২ ফাল্গুন ১৩৪৬

কর্ণধার

ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার,
দিকে দিকে ঢেউ জাগালো
লীলার পারাবার।
আলোক-ছায়া চমকিছে
ক্ষণেক আগে ক্ষণেক পিছে,
অমার আঁধার ঘাটে ভাসায়
নৌকা পূর্ণিমার।
ওগো কর্ণধার,
ডাইনে বাঁয়ে দ্বন্দ্ব লাগে
সত্যের মিথ্যার।

ওগো আমার লীলার কর্ণধার,
জীবনতরী মৃত্যুভাঁটায়
কোথায় করো পার।
নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈববাণী,
গান করে দিন উদ্দেশহীন
অকূল শূন্যতার।
তুমি ওগো লীলার কর্ণধার
রক্তে বাজাও রহস্যময়
মন্ত্রের ঝঙ্কার।

সানাই

তাকায় যখন নিমেষহারা
দিনশেষের প্রথম তারা
ছায়াঘন কুঞ্জবনে
মন্দ মৃদু গুঞ্জরণে
বাতাসেতে জাল বুনে দেয়
মদির তন্দ্রার।
স্বপ্নস্রোতে লীলার কর্ণধার
গোধূলিতে পাল তুলে দাও
ধূসরচ্ছন্দার।

অস্তরবির ছায়ার সাথে
লুকিয়ে আঁধার আসন পাতে।
ঝিল্লিরবে গগন কাঁপে,
দিগঙ্গনা কী জপ জাপে,
হাওয়ায় লাগে মোহপরশ
রজনীগন্ধার।
হৃদয়-মাঝে লীলার কর্ণধার
একতারাতে বেহাগ বাজাও
বিধুর সন্ধ্যার।

রাতের শঙ্খকুহর ব্যেপে
গম্ভীর রব উঠে কেঁপে।
সঙ্গবিহীন চিরন্তনের
বিরহগান বিরাট মনের

কর্ণধার

শূন্যে করে নিঃশবদের
বিষাদবিস্তার।
তুমি আমার লীলার কর্ণধার
তারার ফেনা ফেনিয়ে তোল
আকাশগঙ্গার।

বক্ষে যবে বাজে মরণভেরি
ঘুচিয়ে ত্বরা ঘুচিয়ে সকল দেরি,
প্রাণের সীমা মৃত্যুসীমায়
সূক্ষ্ম হয়ে মিলায়ে যায়,
ঊর্ধ্বে তখন পাল তুলে দাও
অন্তিম যাত্রার।
ব্যক্ত কর, হে মোর কর্ণধার,
আঁধারহীন অচিন্ত্য সে
অসীম অন্ধকার।

উদীচী। শান্তিনিকেতন
২৮ জানুয়ারি ১৯৪০

আসা-যাওয়া

ভালোবাসা এসেছিল
এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,
দিই নি আসন বসিবার।
বিদায় সে নিল যবে, খুলিতেই দ্বার
শব্দ তার পেয়ে,
ফিরায়ে ডাকিতে গেনু ধেয়ে।
তখন সে স্বপ্ন কায়াহীন,
নিশীথে বিলীন—
দূরপথে তার দীপশিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা।

[শান্তিনিকেতন]
২৮ মার্চ ১৯৪০

বিপ্লব

ডমরুতে নটরাজ বাজালেন তাণ্ডবে যে তাল
ছিন্ন করে দিল তার ছন্দ তব ঝংকৃত কিঙ্কিণী
হে নর্তিনী !
বেণীর বন্ধনমুক্ত উৎক্ষিপ্ত তোমার কেশজাল
ঝঞ্ঝার বাতাসে
উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম উচ্ছ্বাসে ;
বদীর্ণ বিত্যুৎঘাতে তোমার বিহ্বল বিভাবরী
হে সুন্দরী !
সীমন্তের সিঁথি তব, প্রবালে খচিত কণ্ঠহার—
অন্ধকারে মগ্ন হল চৌদিকে বিক্ষিপ্ত অলংকার।
আভরণশূন্য রূপ
বোবা হয়ে আছে করি চুপ,
ভীষণ রিক্ততা তার
উৎসুক চক্ষুর 'পরে হানিছে আঘাত অবজ্ঞার।
নিষ্ঠুর নৃত্যের ছন্দে মুগ্ধ-হস্তে-গাঁথা পুষ্পমালা
বিস্রস্ত দলিত দলে বিকীর্ণ করিছে রঙ্গশালা।
মোহমদে ফেনায়িত কানায় কানায়
যে পাত্রখানায়
মুক্ত হত রসের প্লাবন
মত্ততার শেষ পালা আজি সে করিল উদ্‌যাপন।
যে অভিসারের পথে চেলাঞ্চলখানি
নিতে টানি

সানাই

কম্পিত প্রদীপশিখা-'পরে,
তার চিহ্ন পদপাতে লুপ্ত করি দিলে চিরতরে ;
প্রান্তে তার ব্যর্থ বাঁশিরবে
প্রতীক্ষিত প্রত্যাশার বেদনা যে উপেক্ষিত হবে।

এ নহে তো ঔদাসীন্য, নহে ক্লান্তি, নহে বিস্মরণ,
ক্রুদ্ধ এ বিতৃষ্ণা তব মাধুর্যের প্রচণ্ড মরণ,
তোমার কটাক্ষ
দেয় তারি হিংস্র সাক্ষ্য
ঝলকে ঝলকে
পলকে পলকে,
বঙ্কিম নির্মম
মর্মভেদী তরবারি-সম।
তবে তাই হোক,
ফুৎকারে নিবায়ে দাও অতীতের অন্তিম আলোক।
চাহিব না ক্ষমা তব, করিব না দুর্বল বিনতি,
পরুষ মরুর পথে হোক মোর অন্তহীন গতি,
অবজ্ঞা করিয়া পিপাসারে,
দলিয়া চরণতলে ক্রূর বালুকারে।

মাঝে মাঝে কটুস্বাদ দুখে
তীব্র রস দিতে ঢালি রজনীর অনিদ্র কৌতুকে
যবে তুমি ছিলে রহঃসখী।
প্রেমেরই সে দানখানি, সে যেন কেতকী

বিপ্লব

রক্তরেখা এঁকে গায়ে
রক্তস্রোতে মধুগন্ধ দিয়েছে মিশায়ে।
আজ তব নিঃশব্দ নীরস হাস্যবাণ
আমার ব্যথার কেন্দ্র করিছে সন্ধান।
সেই লক্ষ্য তব
কিছুতেই মেনে নাহি লব,
বক্ষ মোর এড়ায়ে সে যাবে শূন্যতলে,
যেখানে উল্কার আলো জ্বলে
ক্ষণিক বর্ষণে
অশুভ দর্শনে।

বেজে ওঠে ডঙ্কা, শঙ্কা শিহরায় নিশীথগগনে—
হে নির্দয়া, কী সংকেত বিচ্ছুরিল স্খলিত কঙ্কণে!

[শান্তিনিকেতন]
২১ জানুয়ারি ১৯৪০

জ্যোতির্বাষ্প

হে বন্ধু, সবার চেয়ে চিনি তোমাকেই
এ কথায় পূর্ণ সত্য নেই।
চিনি আমি সংসারের শত-সহস্রেরে
কাজের বা অকাজের ঘেরে
নির্দিষ্ট সীমায় যারা স্পষ্ট হয়ে জাগে,
প্রত্যহের ব্যবহারে লাগে,
প্রাপ্য যাহা হাতে দেয় তাই—
দান যাহা তাহা নাহি পাই।

অনন্তের সমুদ্রমন্থনে
গভীর রহস্য হতে তুমি এলে আমার জীবনে।
উঠিয়াছ অতলের অস্পষ্টতাখানি
আপনার চারি দিকে টানি।
নীহারিকা রহে যথা কেন্দ্রে তার নক্ষত্রেরে ঘেরি,
জ্যোতির্ময় বাষ্প-মাঝে দূরবিন্দু তারাটিরে হেরি।
তোমা-মাঝে শিল্পী তার রেখে গেছে তর্জনীর মানা,
সব নহে জানা।
সৌন্দর্যের যে পাহারা জাগিয়া রয়েছে অন্তঃপুরে,
সে আমারে নিত্য রাখে দূরে।

[শান্তিনিকেতন]
২৮ মার্চ ১৯৪০

জানালায়

বেলা হয়ে গেল, তোমার জানালা-'পরে
রৌদ্র পড়েছে বেঁকে।
এলোমেলো হাওয়া আমলকী-ডালে-ডালে
দোলা দেয় থেকে থেকে।
মন্থর পায়ে
চলেছে মহিষগুলি,
রাঙা পথ হতে রহি রহি ওড়ে ধূলি,
নানা পাখিদের মিশ্রিত কাকলিতে,
আকাশ আবিল ম্লান সোনালির শীতে।
পসারী হোথায় হাঁক দিয়ে যায়
গলি বেয়ে কোন্ দূরে,
ভুলে গেছি যাহা তারি ধ্বনি বাজে
বক্ষে করুণ সুরে।
চোখে পড়ে খনে খনে
তব জানালায় কম্পিত ছায়া
খেলিছে রৌদ্র-সনে।

কেন মনে হয়, যেন দূর ইতিহাসে
কোনো বিদেশের কবি
বিদেশী ভাষার ছন্দে দিয়েছে এঁকে
এ বাতায়নের ছবি।

সানাই

ঘরের ভিতরে যে প্রাণের ধারা চলে,
সে যেন অতীত কাহিনীর কথা বলে।
ছায়া দিয়ে ঢাকা সুখদুঃখের মাঝে
গুঞ্জনসুরে সুরশৃঙ্গার বাজে।
যারা আসে যায় তাদের ছায়ায়
প্রবাসের ব্যথা কাঁপে,
আমার চক্ষু তন্দ্রা-অলস
মধ্যদিনের তাপে।
ঘাসের উপরে একা বসে থাকি,
দেখি চেয়ে দূর থেকে—
শীতের বেলার রৌদ্র তোমার
জানালায় পড়ে বেঁকে।

[উদীচী। শান্তিনিকেতন]
১৫ জানুয়ারি ১৯৪০

ক্ষণিক

এ চিকন তব লাবণ্য যবে দেখি
মনে মনে ভাবি, একি
ক্ষণিকের 'পরে অসীমের বরদান,
আড়ালে আবার ফিরে নেয় তারে
দিন হলে অবসান।
একদা শিশিররাতে
শতদল তার দল ঝরাইবে
হেমন্তে হিমপাতে,
সেই যাত্রায় তোমারো মাধুরী
প্রলয়ে লভিবে গতি।
এতই সহজে মহাশিল্পীর
আপনার এত ক্ষতি
কেমন করিয়া সয়—
প্রকাশে বিনাশে বাঁধিয়া সূত্র
ক্ষয়ে নাহি মানে ক্ষয়।
যে দান তাহার সবার অধিক দান
মাটির পাত্রে সে পায় আপন স্থান।
ক্ষণভঙ্গুর দিনে
নিমেষ-কিনারে বিশ্ব তাহারে
বিস্ময়ে লয় চিনে।
অসীম যাহার মূল্য সে ছবি
সামান্য পটে আঁকি

মুছে ফেলে দেয় লোলুপেরে দিয়ে ফাঁকি।
দীর্ঘকালের ক্লান্ত আঁখির উপেক্ষা হতে তারে
সরায় অন্ধকারে।
দেখিতে দেখিতে দেখে না যখন প্রাণ
বিস্মৃতি আসি অবগুণ্ঠনে
রাখে তার সম্মান।
হরণ করিয়া লয় তারে সচকিতে,
লুব্ধ হাতের অঙ্গুলি তারে
পারে না চিহ্ন দিতে।

[উদীচী। শান্তিনিকেতন]
১৫ জানুয়ারি ১৯৪০

অনাবৃষ্টি

প্রাণের সাধন কবে নিবেদন
করেছি চরণতলে,
অভিষেক তার হল না তোমার
করুণ নয়নজলে।
রসের বাদল নামিল না কেন
তাপের দিনে।
ঝরে গেল ফুল, মালা পরাই নি
তোমার গলে।

মনে হয়েছিল দেখেছি করুণা
আঁখির পাতে—
উড়ে গেল কোথা শুকানো যূথীর সাথে।

যদি এ মাটিতে চলিতে চলিতে
পড়িত তোমার দান,
এ মাটি লভিত প্রাণ—
একদা গোপনে ফিরে পেতে তারে
অমৃত ফলে।

[শান্তিনিকেতন]
১৩ জানুয়ারি ১৯৪০

নতুন রঙ

এ ধূসর জীবনের গোধূলি
ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি,
মুছে-আসা সেই ম্লান ছবিতে
রঙ দেয় গুঞ্জনগীতি।

ফাগুনের চম্পকপরাগে
সেই রঙ জাগে,
ঘুমভাঙা কোকিলের কূজনে
সেই রঙ লাগে,
সেই রঙ পিয়ালের ছায়াতে
ঢেলে দেয় পূর্ণিমাতিথি।

এই ছবি ভৈরবী-আলাপে
দোলে মোর কম্পিত বক্ষে,
সেই ছবি সেতারের প্রলাপে
মরীচিকা এনে দেয় চক্ষে,
বুকের লালিম রঙে রাঙানো
সেই ছবি স্বপ্নের অতিথি।

[শান্তিনিকেতন]
১৩ জানুয়ারি ১৯৪০

গানের খেয়া

যে গান আমি গাই
জানি নে সে
কার উদ্দেশে।
যবে জাগে মনে
অকারণে
চপল হাওয়া
সুর যায় ভেসে
কার উদ্দেশে।

ঐ মুখে চেয়ে দেখি,
জানি নে তুমিই সে কি
অতীত কালের মুরতি এসেছ
নতুন কালের বেশে।

কভু জাগে মনে,
যে আসে নি এ জীবনে
ঘাট খুঁজি খুঁজি
গানের খেয়া সে মাগিতেছে বুঝি
আমার তীরেতে এসে।

[শান্তিনিকেতন]
১৩ জানুয়ারি ১৯৪০

অধরা

অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে
এ মোর ছন্দোবন্ধনে।
বলাকাপাঁতির পিছিয়ে-পড়া ও পাখি,
বাসা সুদূরের বনের প্রাঙ্গণে।
গত ফসলের পলাশের রাঙিমারে
ধরে রাখে ওর পাখা,
ঝরা শিরীষের পেলব আভাস
ওর কাকলিতে মাখা।

শুনে যাও বিদেশিনী,
তোমার ভাষায় ওরে
ডাকো দেখি নাম ধরে।

ও জানে তোমারি দেশের আকাশ
তোমারি রাতের তারা,
তব যৌবন-উৎসবে ও যে
গানে গানে দেয় সাড়া,
ওর দুটি পাখা চঞ্চলি উঠে
তব হৃৎকম্পনে।
ওর বাসাখানি তব কুঞ্জের
নিভৃত প্রাঙ্গণে।

[শান্তিনিকেতন]
১৩ জানুয়ারি ১৯৪০

ব্যথিতা

জাগায়ো না ওরে, জাগায়ো না।
ও আজি মেনেছে হার
ক্রূর বিধাতার কাছে।
সব চাওয়া ও যে দিতে চায় নিঃশেষে
অতলে জলাঞ্জলি।

দুঃসহ দুরাশার
গুরুভার যাক দূরে
কৃপণ প্রাণের ইতর বঞ্চনা।
আসুক নিবিড় নিদ্রা,
তামসী মসীর তুলিকায়
অতীত দিনের বিদ্রূপবাণী
রেখায় রেখায় মুছে মুছে দিক্
স্মৃতির পত্র হতে,
থেমে যাক ওর বেদনার গুঞ্জন
সুপ্ত পাখির স্তব্ধ নীড়ের মতো।

[শান্তিনিকেতন]
১৩ জানুয়ারি ১৯৪০

বিদায়

বসন্ত সে যায় তো হেসে, যাবার কালে
শেষ কুসুমের পরশ রাখে বনের ভালে।
তেমনি তুমি যাবে জানি,
ঝলক দেবে হাসিখানি,
অলক হতে খসবে অশোক নাচের তালে।

ভাসান-খেলার তরীখানি চলবে বেয়ে,
একলা ঘাটে রইব চেয়ে।

অস্তরবি তোমার পালে
রঙিন রশ্মি যখন ঢালে
কালিমা রয় আমার রাতের
অন্তরালে।

[১৩৪৬]

যাবার আগে

উদাস হাওয়ার পথে পথে
মুকুলগুলি ঝরে—
কুড়িয়ে নিয়ে এনেছি, তাই
লহো করুণ করে।
যখন যাব চলে
ফুটবে তোমার কোলে,
মালা গাঁথার আঙুল যেন
আমায় স্মরণ করে।

ও হাতখানি হাতে নিয়ে
বসব তোমার পাশে
ফুল-বিছানো ঘাসে—
কানাকানির সাক্ষী রইবে তারা,
বউ-কথা-কও ডাকবে তন্দ্রাহারা।

স্মৃতির ডালায় রইবে আভাসগুলি
কালকে দিনের তরে।
শিরীষ-পাতায় কাঁপবে আলো
নীরব দ্বিপ্রহরে।

[১৩৪৬]

সানাই

সারারাত ধ'রে
গোছা গোছা কলাপাতা আসে গাড়ি ভ'রে।
আসে সরা খুরি
ভূরি ভূরি।
এ পাড়া ও পাড়া হতে যত
রবাহূত অনাহূত আসে শত শত ;
প্রবেশ পাবার তরে
ভোজনের ঘরে
ঊর্ধ্বশ্বাসে ঠেলাঠেলি করে ;
ব'সে পড়ে যে পারে যেখানে,
নিষেধ না মানে।
কে কাহারে হাঁক ছাড়ে হৈ হৈ—
এ কই ! ও কই !
রঙিন উষ্ণীষধর
লালরঙা সাজে যত অনুচর
অনর্থক ব্যস্ততায় ফেরে সবে
আপনার দায়িত্বগৌরবে।
গোরুর গাড়ির সারি হাটের রাস্তায়,
রাশি রাশি ধুলো উড়ে যায়,
রাঙা রাগে
রৌদ্রে গেরুয়া রঙ লাগে।

সানাই

ও দিকে ধানের কল দিগন্তে কালিমাধূম্র হাত
উর্ধ্বে তুলি কলঙ্কিত করিছে প্রভাত।
ধান-পচানির গন্ধে
বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
মিশাইছে বিষ।
থেকে থেকে রেলগাড়ি মাঠের ওপারে দেয় শিস।
দুই প্রহরের ঘণ্টা বাজে।

সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি-মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।
কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান
কোন্ উদ্‌ভ্রান্তের কাছে—
বুঝিবার সময় কি আছে!
অরূপের মর্ম হতে সমুচ্ছ্বাসি
উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি।
সন্ধ্যাতারা-জ্বালা অন্ধকারে
অনন্তের বিরাট পরশ যথা অন্তর-মাঝারে,
তেমনি সুদূর স্বচ্ছ সুর
গভীর মধুর
অমর্ত লোকের কোন্ বাক্যের অতীত সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীর কানে দেয় আনি।
নামিতে নামিতে এই আনন্দের ধারা
বেদনার মূর্ছনায় হয় আত্মহারা।
বসন্তের যে দীর্ঘনিশ্বাস

সানাই

বিকচ বকুলে আনে বিদায়ের বিমর্ষ আভাস,
সংশয়ের আবেগ কাঁপায়
সদ্যঃপাতী শিথিল চাঁপায়,
তারি স্পর্শ লেগে
সাহানার রাগিণীতে বৈরাগিণী ওঠে যেন জেগে—
চলে যায় পথহারা অর্থহারা দিগন্তের পানে।

কতবার মনে ভাবি কী যে সে, কে জানে!
মনে হয় বিশ্বের যে মূল উৎস হতে
সৃষ্টির নির্ঝর ঝরে শূন্যে শূন্যে কোটি কোটি স্রোতে,
এ রাগিণী সেথা হতে আপন ছন্দের পিছু পিছু
নিয়ে আসে বস্তুর-অতীত কিছু
হেন ইন্দ্রজাল
যার সুর যার তাল
রূপে রূপে পূর্ণ হয়ে উঠে
কালের অঞ্জলিপুটে।
প্রথম যুগের সেই ধ্বনি
শিরায় শিরায় উঠে রণরণি—
মনে ভাবি এই সুর প্রত্যহের অবরোধ-'পরে
যতবার গভীর আঘাত করে
ততবার ধীরে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়
ভাবী যুগ-আরম্ভের অজানা পর্যায়।
নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব নিকটের অপূর্ণতা তাই
সব ভুলে যাই,

মন যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে
যেথাকার রাত্রিদিন দিনহারা রাতে
পদ্মের কোরক-সম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে।

উদীচী। শান্তিনিকেতন
৪ জানুয়ারি ১৯৪০

পূর্ণা

তুমি গো পঞ্চদশী
শুক্লা নিশার অভিসারপথে
চরম তিথির শশী।
স্মিত স্বপ্নের আভাস লেগেছে
বিহ্বল তব রাতে।
ক্বচিৎ চকিত বিহগকাকলি
তব যৌবনে উঠিছে আকুলি
নব আষাঢ়ের কেতকীগন্ধ-
শিথিলিত নিদ্রাতে।

যেন অশ্রুত বনমর্মর
তোমার বক্ষে কাঁপে থরথর।
অগোচর চেতনার
অকারণ বেদনার
ছায়া এসে পড়ে মনের দিগন্তে,
গোপন অশান্তি
উছলিয়া তুলে ছলছল জল
কজ্জল-আঁখিপাতে।

[শান্তিনিকেতন]
১০ জানুয়ারি ১৯৪০

কৃপণা

এসেছিনু দ্বারে ঘনবর্ষণ রাতে,
প্রদীপ নিবালে কেন অঞ্চলঘাতে !
কালো ছায়াখানি মনে পড়ে গেল আঁকা,
বিমুখ মুখের ছবি অন্তরে ঢাকা,
কলঙ্করেখা যেন
চিরদিন চাঁদ বহি চলে সাথে সাথে।

কেন বাধা হল দিতে মাধুরীর কণা
হায় হায় হে কৃপণা !

তব যৌবন-মাঝে
লাবণ্য বিরাজে,
লিপিখানি তার নিয়ে এসে তবু
কেন যে দিলে না হাতে !

[জানুয়ারি ১৯৪০]

ছায়াছবি

আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি
সজল নীলাকাশে।
আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো স্মরণে তার ভাসে।

বারি-ঝরা বনের গন্ধ নিয়া
পরশহারা বরণমালা গাঁথে আমার প্রিয়া।

আমার প্রিয়া ঘন শ্রাবণধারায়
আকাশ ছেয়ে মনের কথা হারায়,
আমার প্রিয়ার আঁচল দোলে
নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে

[১৩৪৫]

স্মৃতির ভূমিকা

আজি এই মেঘমুক্ত সকালের স্নিগ্ধ নিরালায়
অচেনা গাছের যত ছিন্ন ছিন্ন ছায়ার ডালায়
রৌদ্রপুঞ্জ আছে ভরি।
সারাবেলা ধরি
কোন্ পাখি আপনারি সুরে কুতূহলী
আলস্যের পেয়ালায় ঢেলে দেয় অস্ফুট কাকলি।
হঠাৎ কী হল মতি
সোনালি রঙের প্রজাপতি
আমার রুপালি চুলে
বসিয়া রয়েছে পথ ভুলে।
সাবধানে থাকি, লাগে ভয়,
পাছে ওর জাগাই সংশয়—
ধরা পড়ে যায় পাছে, আমি নই গাছের দলের,
আমার বাণী সে নহে ফুলের ফলের।

চেয়ে দেখি, ঘন হয়ে কোথা নেমে গেছে ঝোপঝাড় ;
সম্মুখে পাহাড়
আপনার অচলতা ভুলে থাকে বেলা-অবেলায়,
হামাগুড়ি দিয়ে চলে দলে দলে মেঘের খেলায়।
হোথা শুষ্ক জলধারা
শব্দহীন রচিছে ইশারা
পরিশ্রান্ত নিদ্রিত বর্ষার। নুড়িগুলি

সানাই

বনের ছায়ার মধ্যে অস্থিসার প্রেতের অঙ্গুলি
নির্দেশ করিছে তারে যাহা নিরর্থক,
নির্ঝরিণী-সর্পিণীর দেহচ্যুত ত্বক্ ।

এখনি এ আমার দেখাতে
মিলায়েছে শৈলশ্রেণী তরঙ্গিত নীলিম রেখাতে
আপন অদৃশ্য লিপি । বাড়ির সিঁড়ির 'পরে
স্তরে স্তরে
বিদেশী ফুলের টব, সেথা জেরেনিয়মের গন্ধ
শ্বসিয়া নিয়েছে মোর ছন্দ ।
এ চারি দিকের এই সব নিয়ে সাথে
বর্ণে গন্ধে বিচিত্রিত একটি দিনের ভূমিকাতে
এটুকু রচনা মোর বাণীর যাত্রায় হোক পার
যে ক'দিন তার ভাগ্যে সময়ের আছে অধিকার ।

মংপু
৮ জুন ১৯৩৯

মানসী

মনে নেই, বুঝি হবে অগ্রহান মাস,
তখন তরণীবাস
ছিল মোর পদ্মাবক্ষ-'পরে।
বামে বালুচরে
সর্বশূন্য শুভ্রতার না পাই অবধি।
ধারে ধারে নদী
কলরবধারা দিয়ে নিঃশব্দেরে করিছে মিনতি।
ও পারেতে আকাশের প্রশান্ত প্রণতি
নেমেছে মন্দিরচূড়া-'পরে।
হেথা-হোথা পলিমাটিস্তরে
পাড়ির নীচের তলে
ছোলা-খেত ভরেছে ফসলে।
অরণ্যে-নিবিড় গ্রাম নীলিমার নিম্নান্তের পটে ;
বাঁধা মোর নৌকাখানি জনশূন্য বালুকার তটে।

পূর্ণ যৌবনের বেগে
নিরুদ্দেশ বেদনার জোয়ার উঠেছে মনে জেগে
মানসীর মায়ামূর্তি বহি।
ছন্দের বুনানি গেঁথে অদেখার সাথে কথা কহি।

ম্লানরৌদ্র অপরাহ্ণবেলা
পাণ্ডুর জীবন মোর হেরিলাম প্রকাণ্ড একেলা

অনারব্ধ সৃজনের বিশ্বকর্তা-সম।
সুদূর দুর্গম
কোন্ পথে যায় শোনা
অগোচর চরণের স্বপ্নে আনাগোনা।
প্রলাপ বিছায়ে দিনু আগন্তুক অচেনার লাগি,
আহ্বান পাঠানু শূন্যে তারি পদপরশন মাগি।

শীতের কৃপণ বেলা যায়।
ক্ষীণ কুয়াশায়
অস্পষ্ট হয়েছে বালি।
সায়াহ্নের মলিন সোনালি
পলে পলে
বদল করিছে রঙ মসৃণ তরঙ্গহীন জলে।

বাহিরেতে বাণী মোর হল শেষ,
অন্তরের তারে তারে ঝংকারে রহিল তার রেশ।
অফলিত প্রতীক্ষার সেই গাথা আজি
কবিরে পশ্চাতে ফেলি শূন্যপথে চলিয়াছে বাজি।
কোথায় রহিল তার সাথে
বক্ষঃস্পন্দে-কম্পমান সেই স্তব্ধ রাতে
সেই সন্ধ্যাতারা।
জন্মসাথিহারা
কাব্যখানি পাড়ি দিল চিহ্নহীন কালের সাগরে
কিছুদিন-তরে;

শুধু একখানি
সূত্রছিন্ন বাণী
সেদিনের দিনান্তের মগ্নস্মৃতি হতে
ভেসে যায় স্রোতে।

[মংপু]
৯ জুন ১৯৩৯

দেওয়া-নেওয়া

বাদল দিনের প্রথম কদমফুল
আমায় করেছ দান,
আমি তো দিয়েছি ভরা শ্রাবণের
মেঘমল্লারগান।
সজল ছায়ার অন্ধকারে
ঢাকিয়া তারে
এনেছি সুরের শ্যামল খেতের
প্রথম সোনার ধান।

আজ এনে দিলে যাহা
হয়তো দিবে না কাল,
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।

স্মৃতিবন্যার উছল প্লাবনে
আমার এ গান শ্রাবণে শ্রাবণে
ফিরিয়া ফিরিয়া বাহিবে তরণী
ভরি তব সম্মান।

[শান্তিনিকেতন]
১০ জানুয়ারি ১৯৪০

সার্থকতা

ফাল্গুনের সূর্য যবে
দিল কর প্রসারিয়া সঙ্গীহীন দক্ষিণ অর্ণবে,
অতল বিরহ তার যুগযুগান্তের
উচ্ছ্বসিয়া ছুটে গেল নিত্য অশান্তের
সীমানার ধারে।

ব্যথার ব্যথিত কারে
ফিরিল খুঁজিয়া,
বেড়ালো যুঝিয়া
আপন তরঙ্গদল-সাথে।

অবশেষে রজনীপ্রভাতে
জানে না সে কখন দুলায়ে গেল চলি
বিপুল নিশ্বাসবেগে একটুকু মল্লিকার কলি।
উদ্‌বারিল গন্ধ তার,
সচকিয়া লভিল সে গভীর রহস্য আপনার।
এই বার্তা ঘোষিল অম্বরে—
সমুদ্রের উদ্‌বোধন পূর্ণ আজি পুষ্পের অন্তরে।

[শান্তিনিকেতন]
৭ আশ্বিন ১৩৪৫

মায়া

আছ এ মনের কোন্ সীমানায়
যুগান্তরের প্রিয়া।
দূরে-উড়ে-যাওয়া মেঘের ছিদ্র দিয়া
কখনো আসিছে রৌদ্র কখনো ছায়া—
আমার জীবনে তুমি আজ শুধু মায়া—
সহজে তোমায় তাই তো মিলাই সুরে,
সহজেই ডাকি সহজেই রাখি দূরে।
স্বপ্নরূপিণী তুমি
আকুলিয়া আছ পথ-খোওয়া মোর
প্রাণের স্বর্গভূমি।
নাই কোনো ভার, নাই বেদনার তাপ,
ধূলির ধরায় পড়ে না পায়ের ছাপ।
তাই তো আমার ছন্দে
সহসা তোমার চুলের ফুলের গন্ধে
জাগে নির্জন রাতের দীর্ঘশ্বাস,
জাগে প্রভাতের পেলব তারায়
বিদায়ের স্মিত হাস।
তাই পথে যেতে কাশের বনেতে
মর্মর দেয় আনি
পাশ-দিয়ে-চলা ধানী-রঙ-করা
শাড়ির পরশখানি।

মায়া

যদি জীবনের বর্তমানের তীরে

আস কভু তুমি ফিরে

স্পষ্ট আলোয়, তবে

জানি না তোমার মায়ার সঙ্গে

কায়ার কি মিল হবে।

বিরহস্বর্গলোকে

সে জাগরণের রূঢ় আলোয়

চিনিব কি চোখে-চোখে!

সন্ধ্যাবেলায় যে দ্বারে দিয়েছ

বিরহকরুণ নাড়া,

মিলনের ঘায়ে সে দ্বার খুলিলে

কাহারো কি পাবে সাড়া!

কালিম্পঙ

২২ জুন ১৯৩৮

অদেয়

তোমায় যখন সাজিয়ে দিলেম দেহ,
করেছ সন্দেহ
সত্য আমার দিই নি তাহার সাথে।
তাই কেবলই বাজে আমার দিনে রাতে
সেই সুতীব্র ব্যথা—
এমন দৈন্য, এমন কৃপণতা,
যৌবন-ঐশ্বর্যে আমার এমন অসম্মান!
সে লাঞ্ছনা নিয়ে আমি পাই নে কোথাও স্থান
এই বসন্তে ফুলের নিমন্ত্রণে।
ধেয়ান-মগ্ন ক্ষণে
নৃত্যহারা শান্ত নদী সুপ্ত তটের অরণ্যচ্ছায়ায়
অবসন্ন পল্লীচেতনায়
মেশায় যখন স্বপ্নে-বলা মৃদু ভাষার ধারা—
প্রথম রাতের তারা
অবাক চেয়ে থাকে,
অন্ধকারের পারে যেন কানাকানির মানুষ পেল কাকে,
হৃদয় তখন বিশ্বলোকের অনন্ত নিভৃতে
দোসর নিয়ে চায় যে প্রবেশিতে,
কে দেয় দুয়ার রুধে,
একলা ঘরের স্তব্ধ কোণে থাকি নয়ন মুদে।
কী সংশয়ে কেন তুমি এলে কাঙাল বেশে।
সময় হলে রাজার মতো এসে

অদেয়

জানিয়ে কেন দাও নি আমায় প্রবল তোমার দাবি।
ভেঙে যদি ফেলতে ঘরের চাবি—
ধুলার 'পরে মাথা আমার দিতেম লুটায়ে,
গর্ব আমার অর্ঘ্য হ'ত পায়ে।
দুঃখের সংঘাতে আজি সুধার পাত্র উঠেছে এই ভ'রে,
তোমার পানে উদ্দেশেতে ঊর্ধ্বে আছি ধ'রে
চরম আত্মদান।
তোমার অভিমান
আঁধার ক'রে আছে আমার সমস্ত জগৎ,
পাই নে খুঁজে সার্থকতার পথ।

কালিম্পঙ
১৮ জুন ১৯৩৮

রূপকথায়

কোথাও আমার হারিয়ে যাবার
নেই মানা
মনে মনে।
মেলে দিলেম গানের সুরের
এই ডানা
মনে মনে।

তেপান্তরের পাথার পেরোই
রূপকথার,
পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই
চুপ-কথার,
পারুলবনের চম্পারে মোর
হয় জানা
মনে মনে।

সূর্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলি
মেঘে মেঘে আকাশকুসুম তুলি।
সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
যাই ভেসে দূর দিশে,
পরীর দেশের বন্ধ দুয়ার
দিই হানা
মনে মনে।

[শান্তিনিকেতন]
১০ জানুয়ারি ১৯৪০

আহ্বান

জ্বেলে দিয়ে যাও সন্ধ্যাপ্রদীপ
বিজন ঘরের কোণে।
নামিল শ্রাবণ, কালো ছায়া তার
ঘনাইল বনে বনে।

বিস্ময় আনো ব্যগ্র হিয়ার পরশপ্রতীক্ষায়
সজল পবনে নীল বসনের চঞ্চল কিনারায়,
দুয়ার-বাহির হতে আজি ক্ষণে ক্ষণে
তব কবরীর করবীমালার বারতা আসুক মনে।

বাতায়ন হতে উৎসুক দুই আঁখি
তব মঞ্জীরধ্বনি পথ বেয়ে
তোমারে কি যায় ডাকি!

কম্পিত এই মোর বক্ষের ব্যথা
অলকে তোমার আনে কি চঞ্চলতা
বকুলবনের মুখরিত সমীরণে।

[শান্তিনিকেতন]
১০ জানুয়ারি ১৯৪০

অধীরা

চির-অধীরার বিরহ-আবেগ
দূরদিগন্তপথে
ঝঞ্ঝার ধ্বজা উড়ায়ে ছুটিল
মত্ত মেঘের রথে।
দ্বার ভাঙিবার অভিযান তার,
বারবার কর হানে,
বারবার হাঁকে 'চাই আমি চাই'—
ছোটে অলক্ষ্য-পানে।

হুহু হুংকার, ঝর্ঝর বর্ষণ,
সঘন শূন্যে বিদ্যুৎঘাতে
তীব্র কী হর্ষণ!
দুর্দাম প্রেম কি এ—
প্রস্তর ভেঙে খোঁজে উত্তর
গর্জিত ভাষা দিয়ে।
মানে না শাস্ত্র, জানে না শঙ্কা,
নাই দুর্বল মোহ—
প্রভুশাপ-'পরে হানে অভিশাপ
দুর্বার বিদ্রোহ।

অধীরা

করুণ ধৈর্যে গণে না দিবস,
সহে না পলেক গৌণ,
তাপসের তপ করে না মান্য,
ভাঙে সে মুনির মৌন।
মৃত্যুরে দেয় টিটকারি তার হাস্যে,
মঞ্জীরে বাজে যে ছন্দ তার লাস্যে
নহে মন্দাক্রান্তা—
প্রদীপ লুকায়ে শঙ্কিত পায়ে
চলে না কোমলকান্তা।

নিষ্ঠুর তার চরণতাড়নে
বিঘ্ন পড়িছে খসে,
বিধাতারে হানে ভর্ৎসনাবাণী
বজ্রের নির্ঘোষে।
নির্লাজ ক্ষুধায় অগ্নি বরষে
নিঃসংকোচ আঁখি,
ঝড়ের বাতাসে অবগুণ্ঠন
উড্ডীন থাকি থাকি।

মুক্ত-বেণীতে, স্রস্ত আঁচলে,
উচ্ছৃঙ্খল সাজে
দেখা যায় ওর মাঝে
অনাদি কালের বেদনার উদ্‌বোধন,
সৃষ্টিযুগের প্রথম রাতের রোদন,

যে নবসৃষ্টি অসীম কালের
সিংহদুয়ারে থামি
হেঁকেছিল তার প্রথম মন্ত্রে
'এই আসিয়াছি আমি'।

মংপু
৮ জুন ১৯৩৮

বাসাবদল

যেতেই হবে।
দিনটা যেন খোঁড়া পায়ের মতো
ব্যাণ্ডেজেতে বাঁধা।
একটু চলা, একটু থেমে-থাকা,
টেবিলটাতে হেলান দিয়ে বসা
সিঁড়ির দিকে চেয়ে।
আকাশেতে পায়রাগুলো ওড়ে
ঘুরে ঘুরে চক্র বেঁধে।
চেয়ে দেখি দেয়ালে সেই লেখনখানি
গেল বছরের,
লাল-রঙা পেন্‌সিলে লেখা—
'এসেছিলুম ; পাই নি দেখা ; যাই তা হলে।
দোসরা ডিসেম্বর।'
এ লেখাটি ধুলো ঝেড়ে রেখেছিলেম তাজা,
যাবার সময় মুছে দিয়ে যাব।
পুরোনো এক ব্লটিং কাগজ
চায়ের ভোজে অলস ক্ষণের হিজিবিজি-কাটা,
ভাঁজ ক'রে তাই নিলেম জামার নীচে।
প্যাক করতে গা লাগে না,
মেজের 'পরে বসে আছি পা ছড়িয়ে।
হাতপাখাটা ক্লান্ত হাতে
অন্যমনে দোলাই ধীরে ধীরে।

সানাই

ডেস্কে ছিল মেডেন্‌-হেয়ার পাতায় বাঁধা
শুকনো গোলাপ,
কোলে নিয়ে ভাবছি বসে—
কী ভাবছি কে জানে।

অবিনাশের ফরিদপুরে বাড়ি,
আনুকূল্য তার
বিশেষ কাজে লাগে
আমার এই দশাতেই।
কোথা থেকে আপনি এসে জোটে
চাইতে না চাইতেই,
কাজ পেলে সে ভাগ্য ব'লেই মানে—
খাটে মুটের মতো।
জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা,
লাগল ক'ষে আস্তিন গুটিয়ে।
ওডিকলোন মুড়ে নিল পুরোনো এক আনন্দবাজারে।
ময়লা মোজায় জড়িয়ে নিল এমোনিয়া।
ড্রেসিং কেসে রাখল খোপে খোপে
হাত-আয়না, রুপোয় বাঁধা বুরুশ,
নখ চাঁচবার উখো,
সাবানদানি, ক্রিমের কৌটো, ম্যাকাসারের তেল।
ছেড়ে-ফেলা শাড়িগুলো
নানা দিনের নিমন্ত্রণের
ফিকে গন্ধ ছড়িয়ে দিল ঘরে।

সেগুলো সব বিছিয়ে দিয়ে চেপে চেপে
পাট করতে অবিনাশের যে সময়টা গেল
নেহাত সেটা বেশি।
বারে বারে ঘুরিয়ে আমার চটিজোড়া
কোঁচা দিয়ে যত্নে দিল মুছে,
ফুঁ দিয়ে সে উড়িয়ে দিল ধুলোটা কাল্পনিক
মুখের কাছে ধ'রে।
দেয়াল থেকে খসিয়ে নিল ছবিগুলো,
একটা বিশেষ ফোটো
মুছল আপন আস্তিনেতে অকারণে।
একটা চিঠির খাম
হঠাৎ দেখি লুকিয়ে নিল
বুকের পকেটেতে।
দেখে যেমন হাসি পেল, পড়ল দীর্ঘশ্বাস।
কার্পেটটা গুটিয়ে দিল দেয়াল ঘেঁষে—
জন্মদিনের পাওয়া,
হল বছর-সাতেক।

অবসাদের ভারে অলস মন,
চুল বাঁধতে গা লাগে নাই সারা সকালবেলা—
আলগা আঁচল অন্যমনে বাঁধি নি ব্রোচ দিয়ে।
কুটিকুটি ছিঁড়তেছিলেম একে-একে
পুরোনো সব চিঠি—
ছড়িয়ে রইল মেঝের 'পরে, ঝাঁট দেবে না কেউ

সানাই

বোশেখমাসের শুকনো হাওয়া ছাড়া।
ডাক আনল পাড়ার পিয়ন বুড়ো,
দিলেম সেটা কাঁপা হাতে রিডাইরেক্টেড ক'রে।
রাস্তা দিয়ে চলে গেল তপসি-মাছের হাঁক,
চমকে উঠে হঠাৎ পড়ল মনে—
নাই কোনো দরকার।
মোটর গাড়ির চেনা শব্দ কখন দূরে মিলিয়ে গেছে
সাড়ে-দশটা বেলায়
পেরিয়ে গিয়ে হাজরা রোডের মোড়।

হল ঘর,
দেয়ালগুলো অবুঝ-পারা তাকিয়ে থাকে ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে
যেখানে কেউ নেই।
সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছে দিল অবিনাশ
ট্যাক্সিগাড়ি-'পরে।
এই দরোজায় শেষ বিদায়ের বাণী
শোনা গেল ঐ ভক্তের মুখে—
বললে, আমায় চিঠি লিখো।
রাগ হল তাই শুনে
কেন জানি বিনা কারণেই।

[শান্তিনিকেতন
অগস্ট্ ১৯৩৮]

শেষ কথা

রাগ করো নাই করো, শেষ কথা এসেছি বলিতে—
তোমার প্রদীপ আছে, নাইকো সলিতে।
শিল্প তার মূল্যবান, দেয় না সে আলো,
চোখেতে জড়ায় লোভ, মনেতে ঘনায় ছায়া কালো
অবসাদে। তবু তারে প্রাণপণে রাখি যতনেই,
ছেড়ে যাব তার পথ নেই।
অন্ধকারে অন্ধদৃষ্টি নানাবিধ স্বপ্ন দিয়ে ঘেরে
আচ্ছন্ন করিয়া বাস্তবেরে।
অস্পষ্ট তোমারে যবে
ব্যগ্রকণ্ঠে ডাক দিই অত্যুক্তির স্তবে
তোমারে লঙ্ঘন করি সে ডাক বাজিতে থাকে সুরে
তাহারি উদ্দেশে আজো যে রয়েছে দূরে।
হয়তো সে আসিবে না কভু,
তিমিরে আচ্ছন্ন তুমি তারেই নির্দেশ কর তবু।
তোমার এ দূত অন্ধকার
গোপনে আমার
ইচ্ছারে করিয়া পঙ্গু গতি তার করেছে হরণ,
জীবনের উৎসজলে মিশায়েছে মাদক মরণ।
রক্তে মোর যে দুর্বল আছে
শঙ্কিত বক্ষের কাছে
তারেই সে করেছে সহায়,
পশুবাহনের মতো মোহভার তাহারে বহায়।

সানাই

সে যে একান্তই দীন,
মূল্যহীন,
নিগড়ে বাঁধিয়া তারে
আপনারে
বিড়ম্বিত করিতেছ পূর্ণ দান হতে
এ প্রমাদ কখনো কি দেখিবে আলোতে।
প্রেম নাহি দিয়ে যারে টানিয়াছ উচ্ছিষ্টের লোভে
সে দীন কি পার্শ্বে তব শোভে!
কভু কি জানিতে পাবে অসম্মানে নত এই প্রাণ
বহন করিছে নিত্য তোমারি আপন অসম্মান;
আমারে যা পারিলে না দিতে
সে কার্পণ্য তোমারেই চিরদিন রহিল বঞ্চিতে।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
২২ মার্চ ১৯৩৯

মুক্তপথে

বাঁকাও ভুরু দ্বারে আগল দিয়া,
চক্ষু করো রাঙা,
ঐ আসে মোর জাত-খোয়ানো প্রিয়া
ভদ্র-নিয়ম-ভাঙা।
আসন পাবার কাঙাল ও নয় তো
আচার-মানা ঘরে—
আমি ওকে বসাব হয়তো
ময়লা কাঁথার 'পরে।
সাবধানে রয় বাজার-দরের খোঁজে
সাধু গাঁয়ের লোক,
ধুলার বরন ধূসর বেশে ও যে
এড়ায় তাদের চোখ।
বেশের আদর করতে গিয়ে ওরা
রূপের আদর ভোলে—

আমার পাশে ও মোর মনোচোরা,
একলা এসো চলে।
হঠাৎ কখন এসেছ ঘর ফেলে
তুমি পথিক-বধূ,
মাটির ভাঁড়ে কোথার থেকে পেলে
পদ্মবনের মধু।

সানাই

ভালোবাসি ভাবের সহজ খেলা
এসেছ তাই শুনে—
মাটির পাত্রে নাইকো আমার হেলা
হাতের পরশগুণে !
পায়ে নূপুর নাই রহিল বাঁধা,
নাচেতে কাজ নাই,
যে চলনটি রক্তে তোমার সাধা
মন ভোলাবে তাই।
লজ্জা পেতে লাগে তোমার লাজ
ভূষণ নেইকো ব'লে,
নষ্ট হবে নেই তো এমন সাজ
ধুলোর 'পরে চ'লে।
গাঁয়ের কুকুর ফেরে তোমার পাশে,
রাখালরা হয় জড়ো,
বেদের মেয়ের মতন অনায়াসে
টাট্টু ঘোড়ায় চড়'।
ভিজে শাড়ি হাঁটুর 'পরে তুলে
পার হয়ে যাও নদী,
বামুনপাড়ার রাস্তা যে যাই ভুলে
তোমায় দেখি যদি।
হাটের দিনে শাক তুলে নাও ক্ষেতে
চুপড়ি নিয়ে কাঁখে,
মটর কলাই খাওয়াও আঁচল পেতে
পথের গাধাটাকে।

মুক্তপথে

মানো নাকো বাদল দিনের মানা,
কাদায়-মাখা পায়ে
মাথায় তুলে কচুর পাতাখানা
যাও চলে দূর গাঁয়ে।
পাই তোমারে যেমন খুশি তাই
যেথায় খুশি সেথা।
আয়োজনের বালাই কিছু নাই
জানবে বলো কে তা।
সতর্কতার দায় ঘুচায়ে দিয়ে
পাড়ার অনাদরে
এসো ও মোর জাত-খোয়ানো প্রিয়ে,
মুক্ত পথের 'পরে।

[শান্তিনিকেতন]
৬ নভেম্বর ১৯৩৬

দ্বিধা

এসেছিলে তবু আস নাই, তাই
জানায়ে গেলে
সমুখের পথে পলাতকা পদপতন ফেলে।
তোমার সে উদাসীনতা
উপহাসভরে জানালো কি মোর দীনতা।
সে কি ছল-করা অবহেলা, জানি না সে
চপল চরণ সত্য কি ঘাসে ঘাসে
গেল উপেক্ষা মেলে।

পাতায় পাতায় ফোঁটা ফোঁটা ঝরে জল,
ছলছল করে শ্যাম বনান্ততল।

তুমি কোথা দূরে কুঞ্জছায়াতে
মিলে গেলে কলমুখর মায়াতে,
পিছে পিছে তব ছায়ারৌদ্রের
খেলা গেলে তুমি খেলে।

[জানুয়ারি ১৯৪০]

আধোজাগা

রাত্রে কখন মনে হল যেন
ঘা দিলে আমার দ্বারে,
জানি নাই আমি জানি নাই,-তুমি
স্বপ্নের পরপারে।
অচেতন মনোমাঝে
নিবিড় গহনে ঝিমিঝিমি ধ্বনি বাজে,
কাঁপিছে তখন বেণুবনবায়ু
ঝিল্লির ঝংকারে।

জাগি নাই আমি জাগি নাই গো,
আধোজাগরণ বহিছে তখন
মৃদুমন্থরধারে।

গভীর মন্দ্রস্বরে
কে করেছে পাঠ পথের মন্ত্র
মোর নির্জন ঘরে।
জাগি নাই আমি জাগি নাই, যবে
বনের গন্ধ রচিল ছন্দ
তন্দ্রার চারি ধারে।

[জানুয়ারি ১৯৪০]

যক্ষ

যক্ষের বিরহ চলে অবিশ্রাম অলকার পথে
পবনের ধৈর্যহীন রথে
বর্ষাবাষ্পব্যাকুলিত দিগন্তে ইঙ্গিত-আমন্ত্রণে
গিরি হতে গিরিশীর্ষে, বন হতে বনে।
সমুৎসুক বলাকার ডানার আনন্দচঞ্চলতা
তারি সাথে উড়ে চলে বিরহীর আগ্রহবারতা
চিরদূর স্বর্গপুরে,
ছায়াচ্ছন্ন বাদলের বক্ষোদীর্ণ নিশ্বাসের সুরে।
নিবিড় ব্যথার সাথে পদে পদে পরমসুন্দর
পথে পথে মেলে নিরন্তর।

পথিক কালের মর্মে জেগে থাকে বিপুল বিচ্ছেদ—
পূর্ণতার সাথে ভেদ
মিটাতে সে নিত্য চলে ভবিষ্যের তোরণে তোরণে
নব নব জীবনে মরণে।
এ বিশ্ব তো তারি কাব্য, মন্দাক্রান্তে তারি রচে টীকা
বিরাট দুঃখের পটে আনন্দের সুদূর ভূমিকা।
ধন্য যক্ষ সেই
সৃষ্টির-আগুন-জ্বালা এই বিরহেই।

হোথা বিরহিণী ও যে স্তব্ধ প্রতীক্ষায়,
দণ্ড পল গণি গণি মন্থর দিবস তার যায়।

যক্ষ

সম্মুখে চলার পথ নাই,
রুদ্ধ কক্ষে তাই
আগন্তুক পান্থ-লাগি ক্লান্তিভারে ধূলিশায়ী আশা
কবি তারে দেয় নাই বিরহের তীর্থগামী ভাষা।
তার তরে বাণীহীন যক্ষপুরী ঐশ্বর্যের কারা
অর্থহারা—
নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক,
অস্তিত্বের এত বড়ো শোক
নাই মর্তভূমে
জাগরণ নাহি যার স্বপ্নমুগ্ধ ঘুমে।
প্রভুবরে যক্ষের বিরহ
আঘাত করিছে ওর দ্বারে অহরহ।
স্তব্ধগতি চরমের স্বর্গ হতে
ছায়ায়-বিচিত্র এই নানাবর্ণ মর্তের আলোতে
উহারে আনিতে চাহে
তরঙ্গিত প্রাণের প্রবাহে।

কালিম্পঙ
২০ জুন ১৯৩৮

পরিচয়

বয়স ছিল কাঁচা,
বিদ্যালয়ের মধ্যপথের থেকে
বার হয়েছি আই-এ'র পালা সেরে।
মুক্ত বেণী পড়ল বাঁধা খোঁপার পাকে,
নতুন রঙের শাড়ি দিয়ে
দেহ ঘিরে যৌবনকে নতুন নতুন ক'রে
পেয়েছিলুম বিচিত্র বিস্ময়ে।

অচিন জগৎ বুকের মধ্যে পাঠিয়ে দিত ডাক
কখন থেকে থেকে—
দুপুরবেলায় অকাল ধারায় ভিজে মাটির আতপ্ত নিশ্বাসে,
চৈত্ররাতের মদির ঘন নিবিড় শূন্যতায়,
ভোরবেলাকার তন্দ্রাবিবশ দেহে
ঝাপসা আলোয় শিশির-ছোঁওয়া আলস-জড়িমাতে।
যে বিশ্ব মোর স্পষ্ট জানার শেষের সীমায় থাকে
তারি মধ্যে, গুণী, তুমি অচিন সবার চেয়ে
তোমার আপন রচন-অন্তরালে।
কখনো বা মাসিক পত্রে চমক দিত প্রাণে
অপূর্ব এক বাণীর ইন্দ্রজাল,
কখনো বা আলগা-মলাট বইয়ের দাগি পাতায়
হাজারোবার-পড়া লেখায় পুরোনো কোন্ লাইন
হানত বেদন বিদ্যুতেরই মতো,

কখনো বা বিকেলবেলায় ট্রামে চ'ড়ে
হঠাৎ মনে উঠত গুন্‌গুনিয়ে
অকারণে একটি তোমার শ্লোক।

অচিন কবি, তোমার কথার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা যেত একটি ছায়াছবি—
স্বপ্নঘোড়ায়-চড়া তুমি খুঁজতে বেরিয়েছ
তোমার মানসীকে
সীমাবিহীন তেপান্তরে,
রাজপুত্র তুমি যে রূপ-কথার।

আয়নাখানার সামনে সেদিন চুল বাঁধবার বেলায়
মনে যদি ক'রে থাকি সে রাজকন্যা আমিই,
হেসো না তাই ব'লে।
তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে-ভাগেই
ছুঁইয়েছিলে রুপোর কাঠি,
জাগিয়েছিলে ঘুমন্ত এই প্রাণ।
সেই বয়সে আমার মতো অনেক মেয়ে
ঐ কথাটাই ভেবেছিল মনে ;
তোমায় তারা বারে বারে পত্র লিখেছিল,
কেবল তোমার দেয় নি ঠিকানাটা।

হায় রে খেয়াল! খেয়াল এ কোন্ পাগলা বসন্তের ;
ঐ খেয়ালের কুয়াশাতে আবছা হয়ে যেত

সানাই

কত দুপুরবেলায়
কত ক্লাসের পড়া,
উছল হয়ে উঠত হঠাৎ
যৌবনেরই খাপছাড়া এক ঢেউ।

রোমান্স্ বলে একেই—
নবীন প্রাণের শিল্পকলা আপ্না ভোলাবার।
আর-কিছুদিন পরেই
কখন ভাবের নীহারিকায় রশ্মি হ'ত ফিকে—
বয়স যখন পেরিয়ে যেত বিশ-পঁচিশের কোঠা,
'হাল-আমলের নভেল প'ড়ে
মনের যখন আব্রু যেত ভেঙে,
তখন হাসি পেত
আজকে দিনের কচিমেয়েপনায়।

সেই-যে তরুণীরা
ক্লাসের পড়ার উপলক্ষে
পড়তে বসে 'ওড্স্ টু নাইটিঙ্গেল',
না-দেখা কোন্ বিদেশবাসী বিহঙ্গমের
না-শোনা সংগীতে
বক্ষে তাদের মোচড় দিত,
ঝরোখা সব খুলে যেত হৃদয়-বাতায়নে
ফেনায়িত সুনীল শূন্যতায়,
উজাড় পরীস্থানে।

বরষ-কয়েক যেতেই
চোখে তাদের জুড়িয়ে গেল দৃষ্টিদহন
মরীচিকায়-পাগল হরিণীর।
ছেঁড়া মোজা শেলাই করার এল যুগান্তর,
বাজার-দরের ঠকা নিয়ে চাকরগুলোর সঙ্গে বকাবকির,
চা-পান-সভায় হাঁটুজলের সখ্যসাধনার।
কিন্তু আমার স্বভাব-বশে
ঘোর ভাঙে নি যখন ভোলামনে
এলুম তোমার কাছাকাছি।

চেনাশোনার প্রথম পালাতেই
পড়ল ধরা, একেবারে দুর্লভ নও তুমি—
আমার লক্ষ্য-সন্ধানেরই আগেই
তোমার দেখি আপনি বাঁধন মানা।
হায় গো রাজার পুত্র,
একটু পরশ দেবামাত্র পড়ল মুকুট খ'সে
আমার পায়ের কাছে,
কটাক্ষেতে চেয়ে তোমার মুখে
হেসেছিলুম আবিল চোখের বিহ্বলতায়।
তাহার পরে হঠাৎ কবে মনে হল—
দিগন্ত মোর পাংশু হয়ে গেল,
মুখে আমার নামল ধূসর ছায়া;
পাখির কণ্ঠে মিইয়ে গেল গান,
পাখায় লাগল উড়ুক্ষু পাগলামি।

পাখির পায়ে এঁটে দিলেম ফাঁস
অভিমানের ব্যঙ্গস্বরে,
বিচ্ছেদেরই ক্ষণিক বঞ্চনায়,
কটুরসের তীব্র মাধুরীতে।

এমন সময় বেড়াজালের ফাঁকে
পড়ল এসে আরেক মায়াবিনী;
রণিতা তার নাম।
এ কথাটা হয়তো জানো—
মেয়েতে মেয়েতে আছে বাজি-রাখার পণ
ভিতরে ভিতরে।
কটাক্ষে সে চাইল আমায়, তারে চাইলুম আমি,
পাশা ফেলল নিপুণ হাতের ঘুরুনিতে,
এক দানেতেই হল তারি জিত।
জিত? কে জানে তাও সত্য কি না।
কে জানে তা নয় কি তারি
দারুণ হারের পালা।

সেদিন আমি মনের ক্ষোভে
বলেছিলুম কপালে কর হানি
চিনব ব'লে এলেম কাছে,
হল বটে নিংড়ে নিয়ে চেনা
চরম বিকৃতিতে।
কিন্তু তবু ধিক্ আমারে, যতই দুঃখ পাই

পাপ যে মিথ্যে কথা।
আপনাকে তো ভুলিয়েছিলুম যেই তোমারে এলেম ভোলাবারে ;
ঘুলিয়ে-দেওয়া ঘূর্ণিপাকে সেই কি চেনার পথ।
আমার মায়ার জালটা ছিঁড়ে অবশেষে আমায় বাঁচালে যে ;
আবার সেই তো দেখতে পেলেম
আজো তোমার স্বপ্নঘোড়ায়-চড়া
নিত্যকালের সন্ধান সেই মানসসুন্দরীকে
সীমাবিহীন তেপান্তরের মাঠে।

দেখতে পেলেম ছবি,
এই বিশ্বের হৃদয়মাঝে
বসে আছেন অনির্বচনীয়া,
তুমি তাঁরি পায়ের কাছে বাজাও তোমার বাঁশি।
এ-সব কথা শোনাচ্ছে কি সাজিয়ে-বলার মতো।
না বন্ধু, এ হঠাৎ মুখে আসে,
ঢেউয়ের মুখে মোতির ঝিনুক যেন
মরুবালুর তীরে।
এ-সব কথা প্রতিদিনের নয় ;
যে তুমি নও প্রতিদিনের সেই তোমারে দিলাম যে অঞ্জলি
তোমার দেবীর প্রসাদ রবে তাহে।
আমি কি নই সেই দেবীরই সহচরী,
ছিলাম না কি অচিন রহস্যে
যখন কাছে প্রথম এসেছিলে।

তোমায় বেড়া দিতে গিয়ে আমায় দিলেম সীমা।
তবু মনে রেখো,
আমার মধ্যে আজও আছে চেনার অতীত কিছু।

[মংপু]
১৩ জুন ১৯৩৯

নারী

স্বাতন্ত্র্যস্পর্ধায় মত্ত পুরুষেরে করিবারে বশ
যে আনন্দরস
রূপ ধরেছিল রমণীতে,
ধরণীর ধমনীতে
তুলেছিল চাঞ্চল্যের দোল
রক্তিম হিল্লোল,
সেই আদি ধ্যানমূর্তিটিরে
সন্ধান করিছে ফিরে ফিরে
রূপকার মনে-মনে
বিধাতার তপস্যার সংগোপনে।
পলাতকা লাবণ্য তাহার
বাঁধিবারে চেয়েছে সে আপন সৃষ্টিতে
প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে।
দুর্বাধ্য প্রস্তরপিণ্ডে দুঃসাধ্য সাধনা
সিংহাসন করেছে রচনা
অধরাকে করিতে আপন
চিরন্তন।
সংসারের ব্যবহারে যত লজ্জা ভয়
সংকোচ সংশয়,
শাস্ত্রবচনের ঘের,
ব্যবধান বিধিবিধানের
সকলই ফেলিয়া দূরে

সানাই

ভোগের অতীত মূল সুরে
নগ্নতা করেছে শুচি
দিয়ে তারে ভুবনমোহিনী শুভ্ররুচি।
পুরুষের অনন্ত বেদন
মর্তের মদিরা-মাঝে স্বর্গের সুধারে অন্বেষণ।
তারি চিহ্ন যেখানে-সেখানে
কাব্যে গানে,
ছবিতে মূর্তিতে,
দেবালয়ে দেবীর স্তুতিতে।
কালে কালে দেশে দেশে শিল্পস্বপ্নে দেখে রূপখানি,
নাহি তাহে প্রত্যহের গ্লানি।
দুর্বলতা নাহি তাহে, নাহি ক্লান্তি—
টানি লয়ে বিশ্বের সকল কান্তি
আদিস্বর্গলোক হতে, নির্বাসিত পুরুষের মন
রূপ আর অরূপের ঘটায় মিলন।
উদ্ভাসিত ছিলে তুমি, অয়ি নারী, অপূর্ব আলোকে
সেই পূর্ণ লোকে—
সেই ছবি আনিতেছে ধ্যান ভরি
বিচ্ছেদের মহিমায় বিরহীর নিত্য সহচরী।

আলমোড়া
১৮ মে ১৯৩৭

গানের স্মৃতি

কেন মনে হয়—
তোমার এ গানখানি এখনি যে শোনালে তা নয়।
বিশেষ লগ্নের কোনো চিহ্ন পড়ে নাই এর সুরে ;
শুধু এই মনে পড়ে, এই গানে দিগন্তের দূরে
আলোর কাঁপনখানি লেগেছিল সন্ধ্যাতারকার
সুগভীর স্তব্ধতায়, সে স্পন্দন শিরায় আমার
রাগিণীর চমকেতে রহি রহি বিচ্ছুরিছে আলো
আজি দেয়ালির দিনে। আজও এই অন্ধকারে জ্বালো
সেই সায়াহ্নের স্মৃতি, যে নিভৃতে নক্ষত্রসভায়
নীহারিকা ভাষা তার প্রসারিল নিঃশব্দ প্রভায়—
যে ক্ষণে তোমার স্বর জ্যোতির্লোকে দিতেছিল আনি
অনন্তের-পথ-চাওয়া ধরিত্রীর সকরুণ বাণী।
সেই স্মৃতি পার হয়ে মনে মোর এই প্রশ্ন লাগে,
কালের-অতীত প্রান্তে তোমারে কি চিনিতাম আগে।
দেখা হয়েছিল না কি কোনো-এক সংগীতের পথে
অরূপের মন্দিরেতে অপরূপ ছন্দের জগতে।

শান্তিনিকেতন
দেয়ালি ১৩৪৫

অবশেষে

যৌবনের অনাহূত রবাহূত ভিড়-করা ভোজে
কে ছিল কাহার খোঁজে,
ভালো করে মনে ছিল না তা।
ক্ষণে ক্ষণে হয়েছে আসন পাতা,
ক্ষণে ক্ষণে নিয়েছে সরায়ে।
মালা কেহ গিয়েছে পরায়ে
জেনেছিনু, তবু কে যে জানি নাই তারে।
মাঝখানে বারে বারে
কত কী যে এলোমেলো
কভু গেল, কভু এল।
সার্থকতা ছিল যেইখানে
ক্ষণিক পরশি তারে চলে গেছি জনতার টানে।

সে যৌবনমধ্যাহ্নের অজস্রের পালা
শেষ হয়ে গেছে আজি, সন্ধ্যার প্রদীপ হল জ্বালা।
অনেকের মাঝে যারে কাছে দেখে হয় নাই দেখা
একেলার ঘরে তারে একা
চেয়ে দেখি, কথা কই চুপে চুপে,
পাই তারে না-পাওয়ার রূপে।

শান্তিনিকেতন
৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮

সম্পূর্ণ

প্রথম তোমাকে দেখেছি তোমার
বোনের বিয়ের বাসরে
নিমন্ত্রণের আসরে।
সেদিন তখনো দেখেও তোমাকে দেখি নি,
তুমি যেন ছিলে সূক্ষ্মরেখিণী
ছবির মতো—
পেন্সিলে-আঁকা ঝাপসা ধোঁয়াটে লাইনে
চেহারার ঠিক ভিতর দিকের
সন্ধানটুকু পাই নে।
নিজের মনের রঙ মেলাবার বাটিতে
চাঁপালি খড়ির মাটিতে
গোলাপি খড়ির রঙ হয় নি যে গোলা,
সোনালি রঙের মোড়ক হয় নি খোলা।
দিনে দিনে শেষে সময় এসেছে আগিয়ে,
তোমার ছবিতে আমারি মনের
রঙ যে দিয়েছি লাগিয়ে।
বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করতে এসে
আনমনা হয়ে শেষে
কেবল তোমার ছায়া
র'চে দিয়ে, ভুলে ফেলে গিয়েছেন—
শুরু করেন নি কায়া।
যদি শেষ ক'রে দিতেন হয়তো

সানাই

হ'ত সে তিলোত্তমা
একেবারে নিরুপমা।
যত রাজ্যের যত কবি তাকে
ছন্দের ঘের দিয়ে
আপন বুলিটি শিখিয়ে করত
কাব্যের পোষা টিয়ে।
আমার মনের স্বপ্নে তোমাকে
যেমনি দিয়েছি দেহ
অমনি তখন নাগাল পায় না
সাহিত্যিকেরা কেহ।
আমার দৃষ্টি তোমার সৃষ্টি
হয়ে গেল একাকার।
মাঝখান থেকে বিশ্বপতির ঘুচে গেল অধিকার।
তুলি যে কেমন আমিই কেবল জানি,
কোনো সাধারণবাণী
লাগে না কোনোই কাজে।
কেবল তোমার নাম ধ'রে মাঝে-মাঝে
অসময়ে দিই ডাক,
কোনো প্রয়োজন থাক্ বা নাইবা থাক্।
অমনি তখনি কাঠিতে-জড়ানো উলে
হাত কেঁপে গিয়ে গুনতিতে যাও ভুলে।
কোনো কথা আর নাই কোনো অভিধানে
যার এত বড়ো মানে।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

উদ্‌বৃত্ত

তব দক্ষিণ হাতের পরশ
করনি সমর্পণ।
লেখে আর মোছে তব আলো ছায়া
ভাবনার প্রাঙ্গণে
খনে খনে আলিপন।

বৈশাখে কৃশ নদী
পূর্ণ স্রোতের প্রসাদ না দিল যদি,
শুধু কুণ্ঠিত বিশীর্ণ ধারা
তীরের প্রান্তে
জাগালো পিয়াসি মন।

যতটুকু পাই ভীরু বাসনার
অঞ্জলিতে
নাই বা উচ্ছলিল,
সারা দিবসের দৈন্যের শেষে
সঞ্চয় সে যে
সারা জীবনের স্বপ্নের আয়োজন।

[মংপু]
৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

ভাঙন

কোন্ ভাঙনের পথে এলে
আমার সুপ্ত রাতে।
ভাঙল যা তাই ধন্য হল
নিঠুর চরণ-পাতে।
রাখব গেঁথে তারে
কমলমণির হারে,
দুলবে বুকে গোপন বেদনাতে।

সেতারখানি নিয়েছিলে
অনেক যতনভরে—
তার যবে তার ছিন্ন হল
ফেললে ভূমি-'পরে।
নীরব তাহার গান
রইল তোমার দান—
ফাগুন-হাওয়ার মর্মে বাজে
গোপন-মত্ততাতে।

শ্রীনিকেতন
১২ জুলাই ১৯৩৯

অত্যুক্তি

মন যে দরিদ্র, তার
তর্কের নৈপুণ্য আছে, ধনৈশ্বর্য নাইকো ভাষার।
কল্পনাভাণ্ডার হতে তাই করে ধার
বাক্য-অলংকার।
কখন হৃদয় হয় সহসা উতলা—
তখন সাজিয়ে বলা
আসে অগত্যাই ;
শুনে তাই
কেন তুমি হেসে ওঠ, আধুনিকা প্রিয়ে,
অত্যুক্তির অপবাদ দিয়ে।
তোমার সম্মানে ভাষা আপনারে করে সুসজ্জিত,
তারে তুমি বারে বারে পরিহাসে কোরো না লজ্জিত
তোমার আরতি-অর্ঘ্যে অত্যুক্তিবঞ্চিত ভাষা হেয়,
অসত্যের মতো অশ্রদ্ধেয়।
নাই তার আলো,
তার চেয়ে মৌন ঢের ভালো।
তব অঙ্গে অত্যুক্তি কি কর না বহন
সন্ধ্যায় যখন
দেখা দিতে আসো।
তখন যে হাসি হাসো
সে তো নহে মিতব্যয়ী প্রত্যহের মতো—
অতিরিক্ত মধু কিছু তার মধ্যে থাকে তো সংহত।

সানাই

সে হাসির অতিভাষা
মোর বাক্যে ধরা দেবে নাই সে প্রত্যাশা।
অলংকার যত পায় বাক্যগুলো তত হার মানে,
তাই তার অস্থিরতা বাড়াবাড়ি ঠেকে তব কানে।
কিন্তু, ওই আশমানি শাড়িখানি
ও কি নহে অত্যুক্তির বাণী।
তোমার দেহের সঙ্গে নীল গগনের
ব্যঞ্জনা মিলায়ে দেয়, সে যে কোন্‌ অসীম মনের
আপন ইঙ্গিত—
সে যে অঙ্গের সংগীত।
আমি তারে মনে জানি সত্যেরও অধিক।
সোহাগবাণীরে মোর হেসে কেন বলো কাল্পনিক।

পুরী
৭ মে ১৯৩৯

হঠাৎ মিলন

মনে পড়ে কবে ছিলাম একা বিজন চরে ;
তোমার নৌকা ভরা পালের ভরে
সুদূর পারের হতে
কোন্ অবেলায় এল উজান স্রোতে।
দ্বিধায়-ছোঁওয়া তোমার মৌনীমুখে
কাঁপতেছিল সলজ্জ কৌতুকে
আঁচল-আড়ে দীপের মতো একটুখানি হাসি,
নিবিড় সুখের বেদন দেহে উঠছিল নিশ্বাসি।

দুঃসহ বিস্ময়ে
ছিলাম স্তব্ধ হয়ে,
বলার মতো বলা পাই নি খুঁজে ;
মনের সঙ্গে যুঝে
মুখের কথার হল পরাজয়।
তোমার তখন লাগল বুঝি ভয়,
বাঁধন-ছেঁড়া অধীরতার এমন দুঃসাহসে
গোপনে মন পাছে তোমায় দোষে।
মিনতি উপেক্ষা করি ত্বরায় গেলে চলে
“তবে আসি” এইটি শুধু ব'লে।
তখন আমি আপন মনে যে গান সারাদিন
গেয়েছিলেম, তাহারি সুর রইল অন্তহীন।

পাথর-ঠেকা নির্ঝর সে, তারি কলস্বর
দূরের থেকে পূর্ণ করে বিজন অবসর

আলমোড়া
২৭ মে ১৯৩৭

গানের জাল

দৈবে তুমি
কখন নেশায় পেয়ে
আপন মনে
যাও চলে গান গেয়ে।
যে আকাশে সুরের লেখা লেখো
বুঝি না তা, কেবল রহি চেয়ে।
হৃদয় আমার অদৃশ্যে যায় চলে,
প্রতিদিনের ঠিক-ঠিকানা ভোলে—
মৌমাছিরা আপনা হারায় যেন
গন্ধের পথ বেয়ে।

গানের টানা জালে
নিমেষ-ঘেরা বাঁধন হতে
টানে অসীম কালে।
মাটির আড়াল করি ভেদন
স্বর্গলোকের আনে বেদন,
পরান ফেলে ছেয়ে

[১৯৩৯]

মরিয়া

মেঘ কেটে গেল

আজি এ সকাল বেলায়।

হাসিমুখে এসো

অলস দিনেরই খেলায়।

আশানিরাশার সঞ্চয় যত

সুখদুঃখেরে ঘেরে

ভ'রে ছিল যাহা সার্থক আর

নিষ্ফল প্রণয়েরে,

অকূলের পানে দিব তা ভাসায়ে

ভাঁটার গাঙের ভেলায়।

যত বাঁধনের

গ্রন্থন দিব খুলে,

ক্ষণিকের তরে

রহিব সকল ভুলে।

যে গান হয় নি গাওয়া

যে দান হয় নি পাওয়া

পুবেন হাওয়ায় পরিতাপ তার

উড়াইব অবহেলায়।

[১৯৩৯]

দূরবর্তিনী

সেদিন তুমি দূরের ছিলে মম,
তাই ছিলে সেই আসন-'পরে যা অন্তরতম।
অগোচরে সেদিন তোমার লীলা
বইত অন্তঃশীলা।
থমকে যেতে যখন কাছে আসি,
তখন তোমার ত্রস্ত চোখে বাজত দূরের বাঁশি।
ছায়া তোমার মনের কুঞ্জে ফিরত চুপে চুপে,
কায়া নিত অপরূপের রূপে।
আশার-অতীত বিরল অবকাশে
আসতে তখন পাশে;
একটি ফুলের দানে
চিরফাগুন-দিনের হাওয়া আনতে আমার প্রাণে।
অবশেষে যখন তোমার অভিসারের রথ
পেল আপন সহজ সুগম পথ,
ইচ্ছা তোমার আর নাহি পায় নতুন-জানার বাধা,
সাধনা নাই, শেষ হয়েছে সাধা।
তোমার পালে লাগে না আর হঠাৎ দখিন-হাওয়া;
শিথিল হল সকল চাওয়া পাওয়া।
মাঘের রাতে আমের বোলের গন্ধ বহে যায়,
নিশ্বাস তার মেলে না আর তোমার বেদনায়।
উদ্‌বেগ নাই, প্রত্যাশা নাই, ব্যথা নাইকো কিছু,
পোষ-মানা সব দিন চলে যায় দিনের পিছু পিছু।

অলস ভালোবাসা
হারিয়েছে তার ভাষাপারের ভাষা।
ঘরের কোণের ভরা পাত্র দুই বেলা তা পাই,
ঝরনাতলার উছল পাত্র নাই।

১৯৩৭

গান

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
এতদিন তারে বুঝিতে পারি নি,
দিন চলে গেছে খুঁজিতে।
শুভখনে কাছে ডাকিলে,
লজ্জা আমার ঢাকিলে,
তোমারে পেরেছি বুঝিতে।

কে মোরে ফিরাবে অনাদরে,
কে মোরে ডাকিবে কাছে,
কাহার প্রেমের বেদনার মাঝে
আমার মূল্য আছে,
এ নিরন্তর সংশয়ে আর
পারি না কেবলই যুঝিতে—
তোমারেই শুধু সত্য পেরেছি বুঝিতে

[শ্যামলী। শান্তিনিকেতন]
৮ ডিসেম্বর ১৯৩৮

বাণীহারা

ওগো, মোর
নাহি যে বাণী,
আকাশে হৃদয় শুধু বিছাতে জানি।
আমি অমাবিভাবরী আলোকহারা
মেলিয়া তারা
চাহি নিঃশেষ পথপানে
নিষ্ফল আশা নিয়ে প্রাণে।
বহুদূরে বাজে তব বাঁশি,
সকরুণ সুর আসে ভাসি
বিহ্বল বায়ে
নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।
তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি
দিই যে ফিরায়ে—
সে কি তব স্বপ্নের তীরে
ভাঁটার স্রোতের মতো
লাগে ধীরে, অতি ধীরে ধীরে।

[১৩৪৬]

অনসূয়া

কাঁঠালের ভুতি-পচা, আম্‌মানি, মাছের যত আঁশ,
রান্নাঘরের পাঁশ,
মরা বিড়ালের দেহ, পেঁকো নর্দমায়
বীভৎস মাছির দল ঐকতান-বাদন জমায়।
শেষরাত্রে মাতাল বাসায়
স্ত্রীকে মারে, গালি দেয় গদ্‌গদ ভাষায়,
ঘুমভাঙা পাশের বাড়িতে
পাড়াপ্রতিবেশী থাকে হুংকার ছাড়িতে।
ভদ্রতার বোধ যায় চলে,
মনে হয় নরহত্যা পাপ নয় ব'লে।
কুকুরটা, সর্ব অঙ্গে ক্ষত,
বিছানায় শোয় এসে, আমি নিদ্রাগত।
নিজেরে জানান দেয় তীব্রকণ্ঠে আত্মশ্লাঘী সতী
রণচণ্ডা চণ্ডী মূর্তিমতী।
মোটা সিঁদুরের রেখা আঁকা,
হাতে মোটা শাঁখা,
শাড়ি লাল-পেড়ে,
খাটো খোঁপা-পিণ্ডটুকু ছেড়ে
ঘোমটার প্রান্ত ওঠে টাকের সীমায়—
অস্থির সমস্ত পাড়া এ মেয়ের সতী-মহিমায়।

সানাই

এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম-রোমান্টিক—
আমি সেই পথের পথিক
যে পথ দেখায়ে চলে দক্ষিনে বাতাসে,
পাখির ইশারা যায় যে পথের অলক্ষ্য আকাশে।
মৌমাছি যে পথ জানে
মাধবীর অদৃশ্য আহ্বানে।
এটা সত্য কিংবা সত্য ওটা
মোর কাছে মিথ্যা সে তর্কটা।
আকাশকুসুমকুঞ্জবনে
দিগঙ্গনে
ভিত্তিহীন যে বাসা আমার
সেখানেই পলাতকা আসা-যাওয়া করে বার-বার।
আজি এই চৈত্রের খেয়ালে
মনেরে জড়ালো ইন্দ্রজালে।
দেশকাল
ভুলে গেল তার বাঁধা তাল।
নায়িকা আসিল নেমে আকাশপ্রদীপে আলো পেয়ে।

সেই মেয়ে
নহে বিংশ-শতকিয়া
ছন্দোহারা কবিদের ব্যঙ্গহাসি-বিহসিত প্রিয়া।
সে নয় ইকনমিক্স্-পরীক্ষা-বাহিনী
আতপ্ত বসন্তে আজি নিশ্বসিত যাহার কাহিনী।

অনসূয়া নাম তার, প্রাকৃতভাষায়
কারে সে বিস্মৃত যুগে কাঁদায় হাসায়,
অশ্রুত হাসির ধ্বনি মিলায় সে কলকোলাহলে
শিপ্রাতটতলে।
পিনদ্ধ বল্কলবন্ধে যৌবনের বন্দী দূত দোঁহে
জাগে অঙ্গে উদ্ধত বিদ্রোহে।
অযতনে এলায়িত রুক্ষ কেশপাশ
বনপথে মেলে চলে মৃদুমন্দ গন্ধের আভাস।
প্রিয়কে সে বলে 'পিয়',
বাণী লোভনীয়—
এনে দেয় রোমাঞ্চহরষ
কোমল সে ধ্বনির পরশ।
সোহাগের নাম দেয় মাধবীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে,
এ মাধুরী যে দেখে গোপনে
ঈর্ষার বেদনা পায় মনে।

যখন নৃপতি ছিল উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্তের মতো
দয়াহীন ছলনায় রত
আমি কবি অনাবিল সরল মাধুরী
করিতেছিলাম চুরি
এলাবনচ্ছায়ে এক কোণে,
মধুকর যেমন গোপনে

সানাই

ফুলমধু লয় হরি
নিভৃত ভাণ্ডার ভরি ভরি
মালতীর স্মিত সম্মতিতে।
ছিল সে গাঁথিতে
নতশিরে পুষ্পহার
সদ্য-তোলা কুঁড়ি মল্লিকার।
বলেছিনু, আমি দেব' ছন্দের গাঁথুনি
কথা চুনি চুনি।

অয়ি মালবিকা,
অভিসারযাত্রাপথে কখনো বহ নি দীপশিখা।
অর্ধাবগুণ্ঠিত ছিলে কাব্যে শুধু ইঙ্গিত-আড়ালে,
নিঃশবদে চরণ বাড়ালে
হৃদয়প্রাঙ্গণে আজি অস্পষ্ট আলোকে—
বিস্মিত চাহনিখানি বিস্ফারিত কালো দুটি চোখে,
বহু মৌনী শতাব্দীর মাঝে দেখিলাম—
প্রিয় নাম
প্রথম শুনিলে বুঝি কবিকণ্ঠস্বরে
দূর যুগান্তরে।
বোধ হল, তুলে ধ'রে ডালা
মোর হাতে দিলে তব আধফোটা মল্লিকার মালা।
সুকুমার অঙ্গুলির ভঙ্গিটুকু মনে ধ্যান ক'রে
ছবি আঁকিলাম বসে চৈত্রের প্রহরে।

অনসূয়া

স্বপ্নের বাঁশিটি আজ ফেলে তব কোলে
আর-বার যেতে হবে চ'লে
সেথা, যেথা বাস্তবের মিথ্যা বঞ্চনায়
দিন চলে যায়।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২০ মার্চ ১৯৪০

শেষ অভিসার

আকাশে ঈশানকোণে মসীপুঞ্জ মেঘ।
আসন্ন ঝড়ের বেগ
স্তব্ধ রহে অরণ্যের ডালে ডালে
যেন সে বাত্বড় পালে পালে।
নিষ্কম্প পল্লবঘন মৌনরাশি
শিকার-প্রত্যাশী
বাঘের মতন আছে থাবা পেতে,
রন্ধ্রহীন আঁধারেতে।
ঝাঁকে ঝাঁক
উড়িয়া চলেছে কাক
আতঙ্ক বহন করি উদ্‌বিগ্ন ডানার 'পরে।
যেন কোন্ ভেঙে-পড়া লোকান্তরে
ছিন্ন ছিন্ন রাত্রিখণ্ড চলিয়াছে উড়ে
উচ্ছৃঙ্খল ব্যর্থতার শূন্যতল জুড়ে।

দুর্যোগের ভূমিকায় তুমি আজ কোথা হতে এলে
এলোচুলে অতীতের বনগন্ধ মেলে।
জন্মের আরম্ভপ্রান্তে আর-একদিন
এসেছিলে অম্লান নবীন

শেষ অভিসার

বসন্তের প্রথম দূতিকা,
এনেছিলে আষাঢ়ের প্রথম যূথিকা
অনির্বচনীয় তুমি।
মর্মতলে উঠিলে কুসুমি
অসীমবিস্ময়-মাঝে, নাহি জানি এলে কোথা হতে
অদৃশ্য আলোক হতে দৃষ্টির আলোতে।
তেমনি রহস্যপথে, হে অভিসারিকা,
আজ আসিয়াছ তুমি ; ক্ষণদীপ্ত বিদ্যুতের শিখা
কী ইঙ্গিত মেলিতেছে মুখে তব—
কী তাহার ভাষা অভিনব।

আসিছ যে পথ বেয়ে সেদিনের চেনা পথ এ কি।
এ যে দেখি
কোথাও বা ক্ষীণ তার রেখা,
কোথাও চিহ্নের সূত্র লেশমাত্র নাহি যায় দেখা।
ডালিতে এনেছ ফুল স্মৃত বিস্মৃত,
কিছু বা অপরিচিত।
হে দূতী, এনেছ আজ গন্ধে তব যে ঋতুর বাণী
নাম তার নাহি জানি।
মৃত্যু-অন্ধকার-ময়
পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আসন্ন তাহার পরিচয়।
তারি-বরমাল্যখানি পরাইয়া দাও মোর গলে
স্তিমিতনক্ষত্র এই নীরবের সভাঙ্গনতলে—

এই তব শেষ অভিসারে
ধরণীর পারে
মিলন ঘটায়ে যাও অজানার সাথে
অন্তহীন রাতে।

মংপু
২৩ এপ্রিল ১৯৪০

নামকরণ

বাদলবেলায় গৃহকোণে
রেশমে পশমে জামা বোনে,
নীরবে আমার লেখা শোনে—
তাই সে আমার শোনামণি।
প্রচলিত ডাক নয় এ যে,
দরদীর মুখে ওঠে বেজে,
পণ্ডিতে দেয় নাই মেজে—
প্রাণের ভাষাই এর খনি।
সেও জানে আর জানি আমি
এ মোর নেহাত পাগলামি—
ডাক শুনে কাজ যায় থামি,
কঙ্কণ ওঠে কনকনি।

সে হাসে, আমিও তাই হাসি—
জবাবে ঘটে না কোনো বাধা।
অভিধানবর্জিত ব'লে
মানে আমাদের কাছে সাদা।
কেহ নাহি জানে কোন্‌ খনে
পশমের শিল্পের সাথে

সানাই

সুকুমার হাতের নাচনে
নূতন নামের ধ্বনি গাঁথে
শোনামণি, ওগো সুনয়নী।

কালিম্পং
গৌরীপুর-ভবন
২৪ মে ১৯৪০

বিমুখতা

মন যে তাহার হঠাৎপ্লাবনী
নদীর প্রায়
অভাবিত পথে সহসা কী টানে
বাঁকিয়া যায়—
সে তার সহজ গতি,
সেই বিমুখতা ভরা ফসলের
যতই করুক ক্ষতি।
বাঁধা পথে তারে বাঁধিয়া রাখিবে যদি
বর্ষা নামিলে খরপ্রবাহিণী নদী
ফিরে ফিরে তার ভাঙিয়া ফেলিবে কূল,
ভাঙিবে তোমার ভুল।
নয় সে খেলার পুতুল, নয় সে
আদরের পোষা প্রাণী,
মনে রেখো তাহা জানি।
মত্তপ্রবাহবেগে
দুর্দাম তার ফেনিল হাস্য
কখন উঠিবে জেগে।
তোমার প্রাণের পণ্য আহরি
ভাসাইয়া দিলে ভঙ্গুর তরী,
হঠাৎ কখন পাষাণে আছাড়ি
করিবে সে পরিহাস,
হেলায় খেলায় ঘটাবে সর্বনাশ।

এ খেলারে যদি খেলা বলি মানো,
হাসিতে হাস্য মিলাইতে জানো,
তা হলে রবে না খেদ।
ঝরনার পথে উজানের খেয়া,
সে যে মরণের জেদ।
স্বাধীন বলো' যে ওরে
নিতান্ত ভুল ক'রে।
দিক্‌সীমানার বাঁধন টুটিয়া
ঘুমের ঘোরেতে চমকি উঠিয়া
যে উল্কা পড়ে খ'সে
কোন্ ভাগ্যের দোষে,
সেই কি স্বাধীন? তেমনি স্বাধীন এও—
এরে ক্ষমা ক'রে যেয়ো।
বন্যারে নিয়ে খেলা যদি সাধ
লাভের হিসাব দিয়ো তবে বাদ,
গিরিনদী-সাথে বাঁধা পড়িয়ো না
পণ্যের ব্যবহারে।
মূল্য যাহার আছে একটুও
সাবধান করি' ঘরে তারে থুয়ো,
খাটাতে যেয়ো না মাতাল চলার
চলতি এ কারবারে।
কাটিয়ো সাঁতার যদি জানা থাকে,
তলিয়ে যেয়ো না আওড়ের পাকে,
নিজেরে ভাসায়ে রাখিতে না জানো

বিমুখতা

ভরসা ডাঙার পারে—
যতই নীরস হোক-না সে তবু
নিরাপদ জেনো তারে।
'সে আমারি' ব'লে বৃথা অহমিকা
ভালে আঁকি দেয় ব্যঙ্গের টিকা।
আলগা লীলায় নাই দেওয়া পাওয়া,
দূর থেকে শুধু আসা আর যাওয়া—
মানবমনের রহস্য কিছু শিখা

[কালিম্পং
জুন ১৯৪০]

আত্মছলনা

দোষী করিব না তোমারে,
ব্যথিত মনের বিকারে,
নিজেরেই আমি নিজে নিজে করি ছলনা।
মনেরে বুঝাই বুঝি ভালোবাসো,
আড়ালে আড়ালে তাই তুমি হাসো—
স্থির জানো, এ যে অবুঝের খেলা,
এ শুধু মোহের রচনা।

সন্ধ্যামেঘের রাগে
অকারণে যত ভেসে-চলে-যাওয়া
অপরূপ ছবি জাগে।
সেইমতো ভাসে মায়ার আভাসে
রঙিন বাষ্প মনের আকাশে,
উড়াইয়া দেয় ছিন্ন লিপিতে
বিরহমিলনভাবনা।

[কালিম্পং]
২৯ মে ১৯৪০

অসময়

বৈকালবেলা ফসল-ফুরানো
শূন্য খেতে
বৈশাখে যবে কৃপণ ধরণী
রয়েছে তেতে,
ছেড়ে তার বন জানি নে কখন
কী ভুল ভুলি
শুষ্ক ধূলির ধূসর দৈন্যে
এসেছিল বুলবুলি।

সকালবেলার স্মৃতিখানি মনে
বহিয়া বুঝি
তরুণ দিনের ভরা আতিথ্য
বেড়ালো খুঁজি।
অরুণে শ্যামলে উজ্জ্বল সেই
পূর্ণতারে
মিথ্যা ভাবিয়া ফিরে যাবে সে কি
রাতের অন্ধকারে।

তবুও তো গান করে গেল দান
কিছু না পেয়ে।
সংশয়-মাঝে কী শুনায়ে গেল
কাহারে চেয়ে!

সানাই

যাহা গেছে সরে কোনো রূপ ধ'রে
রয়েছে বাকি,
এই সংবাদ বুঝি মনে মনে
জানিতে পেরেছে পাখি।

প্রভাতবেলার যে ঐশ্বর্য
রাখে নি কণা,
এসেছিল সে যে হারায় না কভু
সে সান্ত্বনা।
সত্য যা পাই ক্ষণেকের তরে
ক্ষণিক নহে—
সকালের পাখি বিকালের গানে
এ আনন্দই বহে।

১৯৪০

অপঘাত

সূর্যাস্তের পথ হতে বিকালের রৌদ্র এল নেমে।
বাতাস ঝিমিয়ে গেছে থেমে।
বিচালি-বোঝাই গাড়ি চলে দূর নদিয়ার হাটে
জনশূন্য মাঠে।
পিছে পিছে
দড়ি-বাঁধা বাছুর চলিছে।
রাজবংশীপাড়ার কিনারে
পুকুরের ধারে
বনমালী পণ্ডিতের বড়ো ছেলে
সারাক্ষণ বসে আছে ছিপ ফেলে।
মাথার উপর দিয়ে গেল ডেকে
শুকনো নদীর চর থেকে
কাজ্‌লা বিলের পানে
বুনোহাঁস গুগ্‌লি-সন্ধানে।

কেটে-নেওয়া ইক্ষুখেত, তারি ধারে ধারে
দুই বন্ধু চলে ধীরে শান্ত পদচারে
বৃষ্টিধোওয়া বনের নিশ্বাসে,
ভিজে ঘাসে ঘাসে।
এসেছে ছুটিতে—
হঠাৎ গাঁয়েতে এসে সাক্ষাৎ ছুটিতে,
নববিবাহিত একজনা,

সানাই

শেষ হতে নাহি চায় ভরা আনন্দের আলোচনা।
আশে পাশে ভাঁটিফুল ফুটিয়া রয়েছে দলে দলে
বাঁকাচোরা গলির জঙ্গলে,
মৃত্যুগন্ধে দেয় আনি
চৈত্রের ছড়ানো নেশাখানি।
জারুলের শাখায় অদূরে
কোকিল ভাঙিছে গলা একঘেয়ে প্রলাপের সুরে।

টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিন্‌ল্যাণ্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।

[কালিম্পং]
১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭

মানসী

আজি আষাঢ়ের মেঘলা আকাশে
মনখানা উড়ো পক্ষী
বাদলা হাওয়ায় দিকে দিকে ধায়
অজানার পানে লক্ষি।
যাহা-খুশি বলি স্বগত কাকলি,
লিখিবারে চাহি পত্র,
গোপন মনের শিল্পসূত্রে
বুনানো দু-চারি ছত্র।
সঙ্গীবিহীন নিরালায় করি
জানা-অজানার সন্ধি,
গর্‌ঠিকানিয়া বন্ধু কে আছ
করিব বাণীর বন্দী।
না জানি তোমার নামধাম আমি,
না জানি তোমার তথ্য—
কিবা আসে যায় যে হও সে হও
মিথ্যা অথবা সত্য।

সানাই

নিভৃতে তোমারি সাথে আনাগোনা
হে মোর অচিন মিত্র,
প্রলাপী মনেতে আঁকা পড়ে তব
কত অদ্ভুত চিত্র।
যে নেয় নি মেনে মর্ত্য শরীরে
বাঁধন পাঞ্চভৌত্যে
তার সাথে মন করেছি বদল
স্বপ্নমায়ার দৌত্যে।
ঘুমের ঘোরেতে পেয়েছি তাহার
রুক্ষ চুলের গন্ধ।
আধেক রাত্রে শুনি যেন তার—
দ্বার-খোলা দ্বার-বন্ধ।
নীপবন হতে সৌরভে আনে
ভাষাবিহীনার ভাষ্য।
জোনাকি আঁধারে ছড়াছড়ি করে
মণিহার-ছেঁড়া হাস্য।
সঘন নিশীথে গর্জিছে দেয়া,
রিমিঝিমি বারি বর্ষে—
মনে-মনে ভাবি কোন্ পালঙ্কে
কে নিদ্রা দেয় হর্ষে।
গিরির শিখরে ডাকিছে ময়ুর
কবিকাব্যের রঙ্গে—
স্বপ্নপুলকে কে জাগে চমকি
বিগলিতচীর-অঙ্গে।

মানসী

বাস্তব মোরে বঞ্চনা করে
পালায় চকিত নৃত্যে,
তারি ছায়া যবে রূপ ধরি আসে
বাঁধা পড়ি যায় চিত্তে।
তারার আলোকে ভরে সেই সাকী
মদিরোচ্ছল পাত্র—
নিবিড় রাতের মুগ্ধ মিলনে
নাই বিচ্ছেদ মাত্র।
ওগো মায়াময়ী, আজি বরষায়
জাগালে আমার ছন্দ—
যাহা-খুশি সুরে বাজিছে সেতার,
নাহি মানে কোনো বন্ধ।

[কালিম্পং]
২২ মে ১৯৪০

অসম্ভব ছবি

আলোকের আভা তার অলকের চুলে,
বুকের কাছেতে হাঁটু তুলে
বসে আছে ঠেস দিয়ে পিপুল-গুঁড়িতে,
পাশেই পাহাড়ে-নদী নুড়িতে নুড়িতে
ফুলে উঠে চলে যায় বেগে।
দেবদারুছায়াতলে উঠে জেগে
কলস্বর,
কান পেতে শোনে তাই প্রাচীন পাথর—
অরণ্যের কোল
যেন মুখরিয়া তোলে শিশুর কল্লোল।
ইংরেজ কবির লেখা একমনে পড়িছে তরুণী,
গুন্‌গুন্‌ রব তার পিছনে দাঁড়ায়ে আমি শুনি;
মৃদু বেদনায় ভাবি— যে কবির বাণী
পড়িছে বিরাম নাহি মানি
আমি কেন সে কবি না হই।
এতদিন নানাভাবে কাব্যে যাহা কই
আজি এ গিরির মতো কেন সে নির্বাক্‌।
অদূরে মাদারশাখে ঘুঘু দেয় ডাক।
আমার মর্মের ছন্দ পাখির ভাষায়
অফুরান নৈরাশায়
উছলিতে থাকে একতানে
আন'মননীর কানে কানে।

অসম্ভব ছবি

আতপ্ত হতেছে দিন, শিশির শুকায়ে গেছে ঘাসে।
অজানা ফুলের গুচ্ছ উচ্চ শাখে তুলিছে বাতাসে।
ঢালুতটে তরুচ্ছায়াতলে
ঝিলিমিলি শিহরন ঝরনার জলে।
চূর্ণ কেশে নিত্য চঞ্চলতা,
দুর্বাধ্য পড়িছে চোখে, অধ্যয়নরতা
সরায়ে দিতেছে বারংবার
বাহুক্ষেপে। ধৈর্য মোর রহিল না আর;
চকিতে সম্মুখে আসি শুধালাম,
"তুমি কি শোন নি মোর নাম।"
মুখে তার সে কি অসন্তোষ!
সে কি লজ্জা, সে কি রোষ,
সে কি সমুদ্ধত অহংকার!
উত্তর শোনার
অপেক্ষা না করি আমি দ্রুত গেনু চলি।
ঘুঘুর কাকলি
ঘন পল্লবের মাঝে আশ্বিনের রৌদ্র ও ছায়ারে
ব্যথিত করিছে চির নিরুত্তর ব্যর্থতার ভারে।

মিথ্যা, মিথ্যা এ স্বপন! ঘরে ফিরে বসিয়া নির্জনে
শৈল-অরণ্যের সেই ছবিখানি আনি মনে-মনে,
অসম্ভব রচনায়
পূরণ করিনু তারে ঘটে নি যা সেই কল্পনায়

সানাই

যদি সত্য হত— যদি বলিতাম কিছু,
শুনিত সে মাথা করি নিচু,
কিংবা যদি সুতীব্র চাহনি
বিদ্যুৎবাহনী
কটাক্ষে হানিত মুখে
রক্ত মোর আলোড়িয়া বুকে,
কিংবা যদি চলে যেত অঞ্চল সংবরি
শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ বনপথ সচকিত করি,
আমি রহিতাম চেয়ে
হেসে উঠিতাম গেয়ে—
'চলে গেলে হে রূপসী, মুখখানি ঢেকে,
বঞ্চিত কর নি মোরে, পিছনে গিয়েছ কিছু রেখে।'

হায় রে, হয় নি কিছু বলা,
হয় নি ছায়ার পথে ছায়াসম চলা,
হয়তো সে শিলাতল-'পরে
এখনো পড়িছে কাব্য গুন্‌গুন্‌ স্বরে।

শান্তিনিকেতন
১৬ জুলাই ১৯৪০

অসম্ভব

পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ যবে ভাবিনু মনে,
একা একা কোথা চলিতেছিলাম নিষ্কারণে।
শ্রাবণের মেঘ কালো হয়ে নামে বনের শিরে,
খর বিদ্যুৎ রাতের বক্ষ দিতেছে চিরে,
দূর হতে শুনি বারুণী নদীর তরল রব—
মন শুধু বলে অসম্ভব এ অসম্ভব।

এমনি রাত্রে কতবার মোর বাহুতে মাথা
শুনেছিল সে যে কবির ছন্দে কাজরি-গাথা।
রিমিঝিমি ঘন বর্ষণে বন রোমাঞ্চিত,
দেহে আর মনে এক হয়ে গেছে যে বাঞ্ছিত
এল সেই রাতি বহি শ্রাবণের সে বৈভব—
মন শুধু বলে অসম্ভব এ অসম্ভব।

দূরে চলে যাই নিবিড় রাতের অন্ধকারে,
আকাশের সুর বাজিছে শিরায় বৃষ্টিধারে।
যূথীবন হতে বাতাসেতে আসে সুধার স্বাদ,
বেণীবাঁধনের মালায় পেতেম যে সংবাদ
এই তো জেগেছে নবমালতীর সে সৌরভ—
মন শুধু বলে অসম্ভব এ অসম্ভব।

ভাবনার ভুলে কোথা চলে যাই অন্যমনে
পথসংকেত কত জানায়েছে যে বাতায়নে।
শুনিতে পেলেম সেতারে বাজিছে সুরের দান
অশ্রুজলের আভাসে জড়িত আমারি গান।
কবিরে ত্যজিয়া রেখেছ কবির এ গৌরব—
মন শুধু বলে অসম্ভব এ অসম্ভব।

শান্তিনিকেতন
১৬ জুলাই ১৯৪০

গানের মন্ত্র

মাঝে মাঝে আসি যে তোমারে
গান শিখাবারে—
মনে তব কৌতুক লাগে,
অধরের আগে
দেখা দেয় একটুকু হাসির কাঁপন।
যে কথাটি আমার আপন
এই ছলে হয় সে তোমারি।
তারে তারে সুর বাঁধা হয়ে যায় তারি
অন্তরে অন্তরে
কখন তোমার অগোচরে।
চাবি করা চুরি,
প্রাণের গোপন দ্বারে প্রবেশের সহজ চাতুরী,
সুর দিয়ে পথ বাঁধা
যে দুর্গমে কথা পেত পদে পদে পাষাণের বাধা—
গানের মন্ত্রেতে দীক্ষা যার
এই তো তাহার অধিকার।
সেই জানে দেবতার অলক্ষিত পথ
শূন্যে শূন্যে যেথা চলে মহেন্দ্রের শব্দভেদী রথ।
ঘন বর্ষণের পিছে যেমন সে বিদ্যুতের খেলা
বিমুখ নিশীথবেলা

অমোঘ বিজয়মন্ত্র হানে
দূর দিগন্তের পানে,
আঁধারের সংকোচ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে
মেঘমল্লারের ঝড়ে।

শান্তিনিকেতন
১৮ জুলাই ১৯৪০

স্বল্প

জানি আমি ছোটো আমার ঠাঁই—
তাহার বেশি কিছুই চাহি নাই।
দিয়ো আমায় সবার চেয়ে অল্প তোমার দান,
নিজের হাতে দাও তুলে তো
রইবে অফুরান।

আমি তো নই কাঙাল পরদেশী,
পথে পথে খোঁজ করে যে
যা পায় তারো বেশি।
সকলটুকুই চায় সে পেতে হাতে,
পুরিয়ে নিতে পারে না সে
আপন দানের সাথে।

তুমি শুনে বললে আমায় হেসে,
বললে ভালোবেসে,
"আশ মিটিবে এইটুকুতেই তবে?"
আমি বলি, তার বেশি কী হবে।
যে দানে ভার থাকে
বস্তু দিয়ে পথ সে কেবল
আটক করে রাখে।

সানাই

যে দান কেবল বাহুর পরশ তব

তারে আমি বীণার মতো বক্ষে তুলে লব।

সুরে সুরে উঠবে বেজে,

যেটুকু সে তাহার চেয়ে

অনেক বেশি সে যে।

লোভীর মতো তোমার দ্বারে

যাহার আসা-যাওয়া

তাহার চাওয়া-পাওয়া

তোমায় নিত্য খর্ব করে আনে

আপন ক্ষুধার পানে।

ভালোবাসার বর্বরতা,

মলিন করে তোমারি সম্মান

পৃথুল তার বিপুল পরিমাণ।

তাই তো বলি, প্রিয়ে,

হাসিমুখে বিদায় কোরো স্বল্প কিছু দিয়ে ;

সন্ধ্যা যেমন সন্ধ্যাতারাটিরে

আনিয়া দেয় ধীরে

সূর্য-ডোবার শেষ সোপানের ভিতে

সলজ্জ তার গোপন থালিটিতে।

শান্তিনিকেতন

১৭ জুলাই ১৯৪০

অবসান

জানি দিন অবসান হবে,
জানি তবু কিছু বাকি রবে।
রজনীতে ঘুমহারা পাখি
এক সুরে গাহিবে একাকী—
যে শুনিবে, যে রহিবে জাগি,
সে জানিবে তারি নীড়হারা
স্বপন খুঁজিছে সেই তারা
যেথা প্রাণ হয়েছে বিবাগি।
কিছু পরে করে যাবে চুপ
ছায়াঘন স্বপনের রূপ।
ঝরে যাবে আকাশকুসুম,
তখন কূজনহীন ঘুম
এক হবে রাত্রির সাথে।
যে গান স্বপনে নিল বাসা
তার ক্ষীণ গুঞ্জনভাষা
শেষ হবে সব-শেষ রাতে।

শান্তিনিকেতন
১৯ জুলাই ১৯৪০

—

'সানাই' ১৩৪৭ শ্রাবণে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার অধিকাংশ কবিতা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত।—

অত্যুক্তি	পরিচয় ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ
অদেয়	প্রবাসী ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ
অধীরাঃ	বিচিত্রা ১৩৪৫ বৈশাখ
অনসূয়া	প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ
অপঘাত	প্রবাসী ১৩৪৭ শ্রাবণ
অবশেষে	'পালাশেষ' : জয়শ্রী ১৩৪৬ আষাঢ়
অসময়	সাহানা ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
আধোজাগা	রূপ ও রীতি ১৩৪৭ বৈশাখ
আসা-যাওয়া	কবিতা ১৩৪৭ আষাঢ়
উদ্‌বৃত্ত	'গান' : বৈজয়ন্তী ১৩৪৬ কার্তিক
কর্ণধার	'লীলা' : প্রবাসী ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ
ক্ষণিক	কবিতা ১৩৪৭ আষাঢ়
গান	বঙ্গলক্ষ্মী ১৩৪৬ বৈশাখ
গানের স্মৃতি	'তোমারে কি চিনিতাম আগে' : বিচিত্রা ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ
জানালায়	প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
জ্যোতির্বাষ্প	দেশ ১৩৪৭, ২৮ বৈশাখ
দূরবর্তিনী	'অলস মিলন' : কবিতা ১৩৪৪ আশ্বিন
দূরের গান	প্রবাসী ১৩৪৬ চৈত্র
নতুন রঙ	'গোধূলি' : জয়শ্রী ১৩৪৬ চৈত্র
নারী	চতুরঙ্গ ১৩৪৫ আশ্বিন
পরিচয়	প্রবাসী ১৩৪৬ কার্তিক
বাণীহারা	'গান' : জয়শ্রী ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ
বাসাবদল	প্রবাসী ১৩৪৬ আশ্বিন
বিপ্লব	কবিতা ১৩৪৬ চৈত্র

বিমুখতা	প্রবাসী ১৩৪৭ ভাদ্র
মানসী	'ছিন্নস্মৃতি' : পরিচয় ১৩৪৬ শ্রাবণ
মানসী	প্রবাসী ১৩৪৭ শ্রাবণ
মায়া	প্রবাসী ১৩৪৫ শ্রাবণ
মুক্তপথে	কবিতা ১৩৪৩ পৌষ
যক্ষ	প্রবাসী ১৩৪৫ শ্রাবণ
রূপকথায়	'গান' : বঙ্গলক্ষ্মী ১৩৪৬ পৌষ
শেষ অভিসার	সমসাময়িক ১৩৪৭ আষাঢ়
শেষ কথা	পরিচয় ১৩৪৬ বৈশাখ
সম্পূর্ণ	পরিচয় ১৩৪৫ চৈত্র
সার্থকতা	প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
সানাই	প্রবাসী ১৩৪৬ ফাল্গুন
স্মৃতির ভূমিকা	প্রবাসী ১৩৪৬ ভাদ্র
হঠাৎ মিলন	বিচিত্রা ১৩৪৫ শ্রাবণ

পূর্ববর্তী তালিকার কোনো কোনো কবিতা সাময়িকে নামান্তরে প্রকাশ পাইয়াছিল, তালিকায় তাহাও উল্লেখ করা হইল।

'সানাই' গ্রন্থের অনেকগুলি ছোটো ছোটো কবিতার স্বতন্ত্র সংগীতরূপ প্রচলিত আছে। কোথাও-বা গান পূর্বে রচিত হইয়াছে, কোথাও-বা কবিতা। তুলনামূলক পাঠের উদ্দেশে কবিতাগুলির প্রচলিত, গীতবিতানগ্রন্থে মুদ্রিত, সংগীতরূপ যথাক্রমে নির্দেশ করা হইল—

কবিতা	গীতি-রূপান্তরের প্রথম ছত্র
অধরা	অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে
অনাবৃষ্টি	মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন
আধোজাগা	স্বপ্নে আমার মনে হল
আত্মছলনা	দোষী করিব না, করিব না তোমারে

কবিতা	গীতি-রূপান্তর	গীতরচনা-কাল
আহ্বান	এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও	১।৮।১৯৩৯
উদ্‌বৃত্ত	যদি হায়, জীবনপূরণ নাই হল	
কৃপণা	এসেছিনু দ্বারে, তব শ্রাবণরাতে	
গান	যে ছিল আমার স্বপনচারিণী	৮।১২।১৯৩৮
গানের খেয়া	আমি যে গান গাই জানি নে সে কার উদ্দেশে	
গানের জাল	দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে	
ছায়াছবি	আমার প্রিয়ার ছায়া	২৫।৮।১৯৩৮
দ্বিধা	এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে	
দেওয়া-নেওয়া	বাদলদিনের প্রথম কদমফুল	৩০।৭।১৯৩৯
নতুন রঙ	ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত মলিন সেই স্মৃতি	
এবং	ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লান স্মৃতি	
পূর্ণা	ওগো তুমি পঞ্চদশী	
বাণীহারা	বাণী মোর নাহি	
বিদায়	বসন্ত সে যায় তো হেসে, যাবার কালে	
ব্যথিতা	ওরে জাগায়ো না, ও যে বিরাম মাগে	
ভাঙন	তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে সুপ্ত রাতে	
মরিয়া	আজি মেঘ কেটে গেছে সকালবেলায়	
যাবার আগে	এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে	